

মহৎ জীবন

# ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র



অনিল কান্তি বড়ুয়া



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ট্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Prajna Dipti Bhante

ভারত-বাংলা উপমহাদেশের জ্যোতির্ময় সংঘ পুরোধা, মহামান্য সংঘনায়ক,  
ত্রিপিটক বাগীশ্বর, পণ্ডিত প্রবর প্রয়াত  
ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের জীবনালেখ্য-

## মহৎ জীবন ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র

রচনায় :

অনিল কান্তি বড়ুয়া  
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

প্রকাশক :

বাবু নান্টু বড়ুয়া  
কাঝর দীঘির পাড়, গুজরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।  
বর্তমান ঠিকানা : শান্ত নীড়  
বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

পশ্চিম আধার মানিক  
রাউজান, চট্টগ্রাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বৌদ্ধ মৈত্রী পরিষদ

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত)  
পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

মহৎ জীবন  
ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র

অনিল কান্তি বড়ুয়া

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনায় :

ভদন্ত বিপুলবংশ ভিক্সু

আবাসিক, শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার, মোগলটুলী  
প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্সু

উপাধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়  
প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

প্রকাশকাল :

২৫ জানুয়ারী ২০০৫ ইং

১২ মাঘ ১৪১১ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব :

সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সঙ্কর্ম গ্রন্থ প্রকাশনার

সাহায্যার্থে শ্রদ্ধাদান : ৩০/- (ত্রিশ টাকা)

**প্রাপ্তিস্থান**

■ ভদন্ত প্রিয়রত্ন থের

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

■ ভদন্ত সুমনানন্দ ভিক্সু

সম্মোখি বিহার ও পালি কলেজ

পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

■ শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার

মোগলটুলী, আগ্রাবাদ

চট্টগ্রাম।

■ ভদন্ত কে. বোধিমিত্র ভিক্সু

মহাশ্মশান ভাবনা কেন্দ্র

অংকুরঘোনা, গহিরা।



আমার স্মৃতির মন্দিরে নিত্য পূজার বেদীতে  
অধিষ্ঠিত বিনয়াচার্য প্রয়াত

**ভদন্ত বংশদীপ মহাথেরো,**  
পূর্বগুজরা গ্রামের (জয় চাঁদের বাড়ি)  
কীর্তিসাংঘিক রত্ন প্রয়াত

**ভদন্ত ধর্মপাল মহাথেরো**  
এবং

পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের কৃতি সন্তান,  
আলোকিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, ভারতের বুদ্ধগয়াস্থ  
বাংলাদেশ বিহারের অধ্যক্ষ, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের  
পি.এইচ.ডি. গবেষক অকাল প্রয়াত ধর্মদূত

**ভদন্ত বিবেকানন্দ থেরো**  
এম.এ (ডবল্) মহোদয়ের করকমলে  
আমার এই গ্রন্থ পরম শ্রদ্ধাভরে  
অর্পিত হলো ।

প্রণতঃ অনিল কান্তি বড়ুয়া



বাঙালী বৌদ্ধদের প্রাণপুরুষ, জাতীয় ও  
আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব,  
মহামান্য মহাসংঘনাযক  
প্রয়াত শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো মহোদয়ের  
পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে-

প্রণত ঃ  
নান্টু বড়ুয়া

# মহামান্য সংঘরাজ -এর আশীর্বাণী

উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংঘিক মনীষা, সাধক প্রবর, পণ্ডিত, শ্রদ্ধেয় সংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের বর্ণাঢ্য জীবন গাথায়ভরা এক আদর্শ জীবন। জীবনে দুর্লভ সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদন করে সুদুর্লভ আদর্শ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে শীল ও বিনয়ানুকূল জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁর লিখিত দুর্লভ গ্রন্থ সমূহ সমাজের পট পরিবর্তনে আদর্শ জীবন গঠনে এবং সন্তানদের নৈতিকতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তাঁর লিখিত মহামঙ্গল, আমার সমাজ ..... ইত্যাদি গ্রন্থ যুগোপযোগী রচনা। তিনিই একমাত্র সংঘমনীষা যিনি সর্বপ্রথম ভিক্ষু শ্রামণদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন ও সংগ্রাম করে গেছেন। ফলশ্রুতিতে আজ অনেক ভিক্ষুশ্রামণ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে জাতি ও সদ্ধর্ম উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছেন। এমনই একজন মহাপুরুষের জীবনী প্রিয়ভাজন উপ্যুসক অনিল কান্তি বড়ুয়া রচনা করেছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ মহাপুরুষের জীবন থেকে আগামী প্রজন্ম অনেক কিছু জানতে পারবে। বর্তমান সমাজ জানতে পারবে অতীত জীবনকে। আমি এ গ্রন্থটির সফল প্রচার ও গ্রন্থাকারের নিরাময় জীবন কামনা করি।

আশীর্বাদক

অগ্গমহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজ

ধর্মসেন মহাথের

সংঘরাজ

তারিখ : ০৫-১২-০৪ ইং

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা।

# আমাদের কিছু কথা

চট্টগ্রাম জেলায় রাউজান উপজেলা পশ্চিম আধার মানিক অতীব সুপরিচিত একটি গ্রাম। এই পুণ্যময় গ্রামে সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কালের বিবর্তনে অনেক পুণ্যপুরুষের নাম আমাদের স্মৃতির মানসপটে নাই। যাঁদের নাম শুনেছি, যাঁদের দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আজকের এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অনাবিল প্রাণঢালা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের জন্মে ও দীর্ঘ ভিক্ষু জীবনের কর্ম পরিক্রমায় অত্র গ্রাম ধন্য আজ বিশ্বের প্রতিটি বৌদ্ধ দেশে। তাঁদের নাম নতুন প্রজন্ম জানার লক্ষে স্মরণ করছি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে। সেই ক্ষণজন্মা রত্ন সংঘপুরুষগণ হলেন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য সংঘনায়ক পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত প্রজ্ঞালংকার মহাথেরো, মায়ানমার (বার্মা) আকিয়াব অঞ্চলের মহামান্য সংঘরাজ পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বিমলাচার মহাথেরো, অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের মহামান্য সংঘনায়ক পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র মহাথেরো, বিচিত্র ধর্মকথিক পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত সুধর্মানন্দ মহাথেরো, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার ২৫তম মহামান্য সংঘনায়ক পন্ডিতপ্রবর পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত জ্ঞানালোক মহাথেরো ও ভারতের বুদ্ধগয়াস্থ বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি গবেষক অকাল প্রয়াত ধর্মদূত বিবেকানন্দ থেরো এম.এ (ডবল) প্রমুখ। এই প্রয়াত যশস্বী সংঘপুরুষদের জন্মে পুণ্যতীর্থ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশে এই গ্রাম এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

রত্নসংঘ পুরুষদের মধ্যে ত্রিপিটক বাগীশ্বর সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মহাথেরো মহোদয় বৌদ্ধ জগতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর চির প্রব্রজিত জীবনের সুদীর্ঘ কর্ম পরিক্রমার আলোকে একটি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরে অনুভব করে আসছি। মহান প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘ গাণা পণ্ডিতের শ্বাশত ডাকে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলেন, তাঁদের পূত পান্না গাণা গাণা একান্ত কর্তব্য। তাঁদের গৌরবময় জীবনী অধ্যয়ন করে বর্তমান



ভিক্ষুসংঘ ও গৃহী সমাজ চলমান জীবনকে আদর্শ ও চরিত্রবান করার ক্ষেত্রে অনেক দিক নির্দেশনা পেয়ে যাবেন।

ভারত-বাংলা উপমহাদেশের দুই সংঘ পুরুষের স্মৃতিকে চির জাগরুক রাখার মানসে বিগত ২-৩-২০০৪ ইং “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করি। ইতিমধ্যে অত্র প্রকাশনী সংস্থা হতে পরম পূজ্য সংঘনাযক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো মহোদয়ের রচিত আনন্দলোকে, অমৃতের সন্ধানে, সত্য-সাধনা গ্রন্থগুলি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ধর্মপ্রাণ উপাসক/উপাসিকাদের সহযোগীতায় এই প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করি। অত্র প্রকাশনীর মুখ্য উদ্দেশ্য পরম পূজ্য সংঘনাযক ভদন্ত মহোদয়ের গ্রন্থাদি পুনঃমুদ্রিত করা, তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশিত করা এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক অন্যান্য লেখকদের গ্রন্থাদি প্রকাশ করা। আমাদের এই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়নের কার্যে যথাসাধ্য সাহায্য সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণের প্রতি উদার আহবান জানাচ্ছি।

পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া মহোদয় পরম শ্রদ্ধেয় সংঘনাযক ভদন্তের জীবনী গ্রন্থটি রচনা করে “আনন্দমিত্র - বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী”র থেকে ছাপানোর জন্য আমাদের কাছে হস্তান্তর করেন। রাউজান থানাধীন কাঝর দীঘির পাড় গ্রামের উদীয়মান তরুণ সমাজসেবক বাবু নান্টু বড়ুয়া মহোদয় গ্রন্থটি প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে সন্ধর্মের প্রভূত উপকার সাধন করল। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

ইতি-

ভদন্ত বিপুল বংশ ভিক্ষু

আবাসিক, শ্যামানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার  
মোগলটুলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু

উপাধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠাতা

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।

## এক যুগ পুরুষের জীবন পর্যালোচনা

মহানায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র যৌবনের উষালগ্নে ছিলেন সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতায় প্রদীপ্ত বিপ্লবী। ভারত উপ-মহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের শোষণ নিপীড়নের অবসানে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম উদগাতা চট্টলার অগ্নিগর্ভ সন্তান মাষ্টার দা সূর্যসেনের প্রত্যক্ষ পরশধন্য ছিলেন রাউজান থানার পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের সেই যতীন্দ্র মোহন; যিনি কালে অখিল ভারতীয় ভিক্ষুসংঘের মহানায়কের পদে বৃত হয়েছিলেন। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রের জীবনে পিতামাতার সূত্রে পাওয়া ধর্ম প্রেমের পাশাপাশি বিপ্লবী চিন্তাধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা ভদন্ত আনন্দমিত্রের সমগ্র জীবনকেই প্রভাবিত করেছে গভীরভাবে। বুদ্ধের মহামৈত্রী, মহাকরুণার সাথে মার্কসীয় দর্শনতত্ত্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষিত নিপীড়িত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে বৈপ্লবিক চেতনার এক অন্তঃগতীর সম্পর্ক অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এই সম্পর্ক বিপ্লবের সহিংস চেতনা অহিংস আত্মত্যাগে যে উদ্ভূত করতে সক্ষম, তা আমার ব্যক্তি জীবনেই পরিক্ষীত সত্য। মহাসংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো মহোদয়ের জীবনেও তা-ই হয়েছে। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়ে যেদিন মহান বুদ্ধের আদর্শে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, সেই থেকে জীবনের অস্তিমকাল পর্যন্ত ছিলেন, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। কৈশোরে গৃহীজীবনে তিনি ছিলেন সদাচারী মেধাবী ছাত্র। রাউজান আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত শীলানন্দ মহাথেরো মহোদয়ের বর্ণনা মতে, এই মেধাবী ছাত্র প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাউজানে কিছুকাল যখন শিক্ষকতা করেছিলেন, তখন সেই গ্রামের এক বিত্তবান পরিবার হতে তাদের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল আকর্ষণীয় যৌতুকের মাধ্যমে। বলা হয়েছিল, কন্যাকে মাথা হতে পা পর্যন্ত স্বর্ণালংকারে আচ্ছাদন করে দেয়া হবে। আর জামাতাকে ডাক্তারী পড়ার যাবতীয় খরচ দেয়া হবে। কিন্তু ত্যাগ ও বিরাগপ্রবণ যতীন্দ্রের মন স্বাভাবিক ভাবেই প্রব্রজ্যাকে বরণ করে নিল।

যতীন্দ্র প্রব্রজিত হয়ে আনন্দমিত্র হলেন। তাঁর বিপ্লবী চেতনার তেজ-বীর্যকে তিনি নিয়োগিত করলেন বুদ্ধের জীবন দর্শনের গবেষণা ও অনুসন্ধানে। তাই ১৯৩৬

খৃস্টাব্দে তিনি আকিয়াবের পোতুলি মহাশ্মশানে আশ্রয় নিয়ে ধ্যান ও ধূতাস্ত্র অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করলেন। এ সময়ের যেই বর্ণনা ভদন্ত মহোদয়ের বিখ্যাত রচনা ‘আমার সমাজ’ নামক গ্রন্থের ৪০নং পৃষ্ঠায় যেই বর্ণনা আছে, তা ভদন্ত মহোদয়ের জীবনী গ্রন্থের লেখক উপাসক অনিল বাবুর বর্ণনার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতা পায়নি। এখানে ভদন্ত আনন্দমিত্র মহোদয় বলেন,

১৯৩৬ ইংরেজীতে আমি যখন আকিয়াব পোতুলি মহাশ্মশানে কয়েকটি ধূতাস্ত্র ব্রত পূর্ণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া, মাত্র একবেলা আহারের দ্বারা ভিক্ষু-ধর্ম পালন করিতেছিলাম, .....।

ঐ সনের চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে ইটালিয়ান লোকনাথ ভিক্ষু রাত্রি প্রায় ৯টার সময় মোটরে আমার নিকট, সেই শ্মশানে গিয়া, আমাকে শহরের উত্তর পার্শ্বে হেণ্ডুচু বিহারে নিয়া আসেন। সেই সময়ে রাঙ্গুনীয়ার সোনাইছড়ির বন্ধিম তাঁহার সেবক ছিল।.....

চৈত্র সংক্রান্তির দুইদিন পূর্বেই সেইখান হইতে আমরা মিউহং (পাথরকিল্লা) তাজ্জিতসু নাম অরণ্যাশ্রমে গমন করি। সেই গভীর অরণ্যাশ্রমে চৈত্রের ২৯, ৩০ তারিখ এবং ১লা বৈশাখ, এই তিনদিন ধরিয়া প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক নর-নারী উপোসথ শীল পালন করেন এবং ধর্মশ্রবণ ও ধর্মালোচনাদি পুণ্যকাজ সম্পাদন করেন। সেই উৎসবের পর লোকনাথ ভিক্ষু লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। আমি, একজন বার্মা শ্রামণ ও চট্টগ্রামবাসী একজন হিন্দু শ্রামণ নিয়া সেইখানে বর্ষাবাস করি। আমরা সকলেই ধূতাস্ত্রব্রত পালন করিতাম বলিয়া ভিক্ষা করে মাত্র এক বেলাই নিরামিষ আহার করিতাম। যাহারা আমাদের দায়ক ছিলেন তাহারা একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। সেই কমিটি হইতেই আমাদের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ হইত। আমাদের জন্য যেই সেবক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহাকে মাসিক ৮ টাকা মাহিনা দিতে হইত। বিহারে একটি নিরামিষ তরকারী পাক করা হইত এবং আমাদের জনপ্রতি ১/২ সের দুধ ও তিনখানি করিয়া বিলাতি বিস্কুট দেওয়া হইত...”

“আমার সমাজ” গ্রন্থের লেখক মহোদয় বড়ুয়া বৌদ্ধ মাতা-পিতার ঘরে জন্মের গভীর টানে এই হতভাগ্য সমাজের জন্যে এক মহাকল্যাণকামীর দায়িত্ব গ্রহণ

করেছিলেন। বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের বিরাজমান অত্যন্ত ক্ষতিকর দোষত্রুটিগুলো প্রদর্শন করতে তিনি যেমন উদ্যোগী হয়েছিলেন; একইভাবে মাতা-পিতার পরম হৃদয় দিয়ে সুদক্ষ শৈল্য বিদের ন্যায় সুচিকিৎসার উপায় সমূহ ও প্রদর্শন করেছেন ‘আমার সমাজ’ নামের অমর কাব্যে। এ গ্রন্থের ৪০-৪১নং পৃষ্ঠায় লেখক মহোদয় বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের প্রাণ নামক ভিক্ষুদের আদর্শ জীবন গঠনে ভিক্ষুদের মাতা-পিতা স্থানীয় দায়কদের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, অবহেলা, এমন কি ভয়ানক হীনমন্যতার বহু বাস্তব ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ জীবনকে একটি সর্বাঙ্গীন আদর্শ জীবন দানের চেষ্টায় “আমার সমাজ” নামক রত্নোপম গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক মহামূল্যবান অভিভাবকের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। তাই এ গ্রন্থের পুনঃ মুদ্রণ এবং বহুল প্রচার কামনা করি।

মহাসংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহোদয়ের জীবনীতে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার ছতরপিটুয়া নামক মহাঅরণ্যে অবস্থানকালীন সময়ের বর্ণনা ও পূর্ণাঙ্গতা পায়নি। এ প্রসঙ্গে সাধক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহোদয় বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সাধক পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যা বলেছেন, তা বনভন্তের মুখে এভাবেই শুনেছি-

ছতরপিটুয়ার এই মহাঅরণ্যে তিনি যখন একটি ছোট্ট পর্ণ কুঠিরে একাকী ধ্যান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি হাতি, বাঘ ও সাপের দ্বারা খুবই উপদ্রুত হয়েছিলেন। সেই কুঠিরের আশে পাশে নানা জাতীয় সাপের আনাগোনা প্রায় দেখা যেত। একরাতে তিনি কুঠিরের দরজা খোলার মুহূর্তেই দেখতে পেলেন এক মস্ত বড়ো সাপ দরজা জুড়ে ফনা তুলে বসে আছে। তিনি নানা চেষ্টা করে তাকে সরে যেতে বাধ্য করলেন। আর এক রাতে দেখলেন কুঠিরের দরজা বরাবর উঠানে এক বাঘ জ্বল-জ্বল চোখে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে। সেই অরণ্যে হাতির আনাগোনা প্রায় থাকতো। কিন্তু কোনদিন কুঠিরের কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু এক রাতে একটি হাতি এসে কুঠিরের বাঁশের চালা ধরে বার বার টানাটানি করছিল। ভদন্ত আনন্দমিত্র তখন মঞ্চ ধ্যান উপবিষ্ট অবস্থা হতে চোখ খুলে দেখলেন যে, হাতিটি এক পর্যায়ে তার শুড়টা কুঠিরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করছে। এতে তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। আত্মরক্ষার জন্যে

ঘরের তীরে উঠে বসলেন। তাতেও নিরাপদ না দেখে তিনি বুদ্ধি করে তার সাদা ছাতাটা সেই হাতিকে লক্ষ্য করে উঠানে ছুঁড়ে মারলেন। যখন দেখলেন যে, সেই ছাতাটা নিয়ে হাতিটি খেলতে শুরু করেছে; তখন তিনি কুঠির থেকে বের হয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলেন। সেই রাত্রে গ্রামে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীকে তাঁর অবস্থা জানানলেন। গ্রামবাসী আগুনের মশাল জ্বালিয়ে কুঠিরে উপস্থিত হয়ে হাতিকে সরে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

ছত্রপিতুয়ার আরণ্যিক এতসব উপদ্রব সত্ত্বেও আরণ্যিক নির্জনতা তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু, তিনি তথাকার নেতৃস্থানীয় উচ্চ শিক্ষিত এক দায়কের ব্যবহারে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। খুব সম্ভব, ছত্রপিতুয়া অরণ্য ত্যাগে সেই মনোবেদনা সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে। এই দায়কটির কপটচারিতার কথা তিনি বহুবার বহুস্থানে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহু স্থানে সমাজে উচ্চ শিক্ষিত, এ জাতীয় বহু কপট লোকের, একই পর্যায়ের আচার আচরণে এতই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, কথায় কথায় তিনি তাদেরকে ‘শিক্ষিত মূর্খ’ বলে অভিহিত করতেন।

রাজ্যমাটি রাজবন বিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে দীর্ঘ ছয় বছর কাল আমার অবস্থান সময়ে শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভণ্ডে সম্পর্কে আরো কয়েকটি ঘটনার কথা আমরা প্রায় শুনতে পেতাম। শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আনন্দমিত্র তখন বেতাগীর দ্রোণ বারুঁদের পাহাড়ে অবস্থিত বন বিহারে অবস্থান করছিলেন। এখানে তিনি ১৯৪৮ থেকে ৫১ খৃঃ পর্যন্ত ছিলেন। অপরদিকে শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে তখন চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে প্রয়াত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির মহোদয়ের নিকটে প্রব্রজ্যা নিয়ে সাধনানন্দ শ্রামণ অবস্থায় ছিলেন। সাধক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের বেতাগী-পাহাড়ে ধ্যান করছেন শুনে সেই সাধনানন্দ শ্রামণ একদিন নৌপথে সেখানে উপস্থিত হলেন। ধ্যান-সাধনা বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনার পর শ্রামণ সাধনানন্দ যখন সেখানে থাকতে চাইলেন; তখন না-কি ভণ্ডে আনন্দমিত্র মহোদয় বলেছিলেন, -এখানে লোকেরা তেমন শ্রদ্ধাবান নহে। আমি চারি প্রত্যয়ের (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ-পথ্য) খুবই কষ্টে আছি। তাই তোমাকে থাকতে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ‘আমার সমাজ’ নামক গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা হতে ৪১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

লেখায় বড়ুয়া সমাজের এই বেদনাদায়ক ছবিই ভেসে উঠেছে।

মহাসংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র ভক্তের জীবনী গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি আকিয়াব থেকে দেশে ফিরে আসার পর বেশকিছু কাল আরণ্যিক জীবনে ছিলেন। কিন্তু জীবনী গ্রন্থকারের বর্ণনামতে তিনি এ সময়ে প্রায় প্রত্যহ স্থানীয় ও দূরাগত দর্শনার্থী এবং ধর্মশ্রবণার্থীগণকে ধর্মদেশনায় ব্যাপৃত থাকতেন। আকিয়াবে তাঁর আরণ্যিক ও শাশানিক জীবনে কিন্তু, এমনটি দেখা যায়নি। নির্জন বিহারী ধ্যানকামীর জীবনে এমন ব্যাপকগণ সংযোগ সপ্তাহে অথবা মাসে, একবার হলে, ধ্যান সাধনার অন্ত রায় কম হয়। আকিয়াব থেকে দেশে ফিরে যদি তিনি ধর্মপ্রচারের ব্রতকে প্রাধান্য দিতেন, তবে নিশ্চয়ই একস্থান থেকে অন্যস্থানে চারিকং-ব্রত নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু, এমন কোন উল্লেখ জীবনী গ্রন্থে দেখা যায় না।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ সঙ্গায়নে যোগদান উপলক্ষে রেঙ্গুনে গমন পথে তিনি তাঁর পুরনো সাধন তীর্থ আকিয়াবে গমন করেছিলেন এবং তথাকার প্রজ্জালোক মিশন স্কুলের কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। বহুকাল পর এই প্রথম অভাগা বড়ুয়া সমাজের অন্যতম প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী বীর্য স্তম্ভ ভদন্ত প্রজ্জালোক মহাস্থবিরের সত্যিকার জীবন দর্শনের সাথে আমার পরিচয় লাভ সম্ভব হলো। ভদন্ত প্রজ্জালোক সত্যিকার অর্থেই একজন প্রগতিশীল ধর্মদর্শন ও সমাজ চিন্তার দার্শনিক ছিলেন। তিনি একাধারে মহান ত্রিপিটকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, বিনয়শীলের অনুশীলনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল, বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের আর্থিক দৈন্যতা, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসরতা, এবং কু-সংস্কার ও কৃপমণ্ডুকতা দূরীকরণে অসাধারণ দূরদর্শী এক অগ্রনায়ক ছিলেন তৎকালীন বড়ুয়া বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবনে। মহাপ্রয়াণের কিছুকাল আগে পর্যন্ত বীর, পরাক্রমশালী অক্লান্ত এই ধর্মসৈনিক বড়ুয়াদের সৃষ্ট হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে, একক জীবনে যা করে গেছেন তা অভাবনীয়। চট্টগ্রামে সেবাসদন, রেঙ্গুনে বৌদ্ধমিশন প্রেস ও শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ আকিয়াবে মিশন স্কুলের প্রতিষ্ঠা অনেক অনেক কীর্তি এই মহা ধর্ম ও কর্মবীরের। ভদন্ত আনন্দমিত্রের জীবনী অগ্রমহাপন্ডিত প্রজ্জালোক মহাস্থবিরের কর্মকীর্তির কিঞ্চিৎ, এই উল্লেখে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি উপাসক অনিল বাবুকে।

বার্মা সরকারের বৃত্তি নিয়ে ভদন্ত আনন্দমিত্র ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ, এই দীর্ঘ পাঁচ বছর শ্রীলংকায় জাম্বু ঞ্ণানপুনিকা, মহাপণ্ডিত বুদ্ধদত্ত ও আনন্দমৈত্রেয় প্রমুখ বেশ কিছু প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের সান্নিধ্যে ছিলেন বলে উল্লেখ আছে তাঁর জীবনী গ্রন্থে। কিন্তু, তিনি তথা শিক্ষা করেছেন, না গবেষণা করেছেন তার কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই জীবনী গ্রন্থে। কিন্তু কলম্বোর স্বরস্বতী পরিবেশ থেকে ‘ত্রিপিটক বাগ্গীশ্বর’ এই উপাধি লাভের যে কথা আমরা জানি, সেই উপাধি গবেষণামূলক স্বীকৃতির পরিচায়ক। জীবনী গ্রন্থে কিন্তু, তেমন কোন গবেষণার বিষয় বা গবেষণা গ্রন্থের উল্লেখ ও আমরা পাই না। ভদন্ত মহোদয়ের জীবনে মঙ্গলসূত্রের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট ‘মহামঙ্গল’ নামে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ ও সত্য সংগ্রহ অনুবাদসহ গবেষণামূলক ডজন খানেক পুস্তক রচনা করেছেন। আমরা জানি যে, মহাসংঘনাযক ভদন্ত আনন্দমিত্রের প্রব্রজ্যা গুরু অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির এবং উপসম্পদা গুরু বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবির এই দুই পালি ভাষাভিজ্ঞ এবং ত্রিপিটক অভিজ্ঞ যুগপুরুষের দীর্ঘ সান্নিধ্য ধন্য ছিলেন ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাস্থবির। তাঁদের শিক্ষা সুশিক্ষিত মেধাবী পুরুষ ভদন্ত আনন্দমিত্র পালি ভাষা ও পিটকীয় দক্ষতা গুণেই তিনি রেঙ্গুনের ৬ষ্ঠ ধর্ম সঙ্ঘায়নে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সঙ্ঘায়ন শেষে বার্মা সরকারের বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ বঙ্গীয় ভিক্ষুসংঘের মধ্যে একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন। দক্ষ ইংরেজী ভাষা অভিজ্ঞ বিএ পাশ আবুরখিলের বঙ্গীশ ভিক্ষুর সৌভাগ্যে ও তখন সেই সুযোগ আসেনি। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায় ভদন্ত আনন্দমিত্র কর্তৃক বার্মা সরকারের বৃত্তি লাভের যোগ্যতা অর্জনে কাজ করছিল, ভদন্ত মহোদয় পালি ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা এবং পালি ত্রিপিটকের উপর অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা।

১৯৬০ হতে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাউজান থানার বিনাজুরী শাশান বিহারে সাধক আনন্দমিত্রের অবস্থানকালীন এক অনুপমচিত্র জীবনীকার তুলে ধরেছেন। তথায় ভদন্ত আনন্দমিত্র ৫/৭ জন ভিক্ষু শ্রামণকে ধর্ম বিনয়ে শিক্ষা দান করেছেন, সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় স্থানীয় জনগণকে ধ্যান শিক্ষা ও ধর্মদেশনা করতেন। শিক্ষক আনন্দমিত্র, দেশক আনন্দমিত্র, সাধক আনন্দমিত্র হতে ইহাই ছিল সত্যিকার প্রাপ্তি, যথাযোগ্য প্রাপ্তি। কিন্তু সেই সৌভাগ্য ও বেশী দিন সহ্য

হলো না আত্মঘাতী প্রবৃত্তিতে চিরকাল অভ্যস্ত বড়ুয়াদের ভাগ্যে। বড়ুয়া সমাজের একজন আদর্শ খাঁটি শিক্ষক, একজন সত্যিকার অভিভাবক মহাপুরুষ ভদন্ত আনন্দমিত্রের অপ্রিয় সত্যবাদীতা স্থানীয় মোড়লদের ছিল অসহ্য। তারা নোংরা গ্রাম্য রাজনীতির শিকারে পরিণত করলেন মহাকরুণাঘন কল্যাণমিত্র ভদন্ত আনন্দমিত্রকে। অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে তাই একদিন নীরবে তিনি চিরদিনের তরে পাড়ি জমালেন জন্মভূমি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে। জীবনীকার অনিল বাবু মহাসংঘনায়ক আনন্দমিত্রের জীবনের এই বেদনাময় অসংখ্য চিত্রের কিছুই তুলে ধরতে সক্ষম হননি। অন্যের জীবনী লিখতে গিয়ে লেখকগণ প্রায় ক্ষেত্রেই এমনটি করে থাকেন। এ কারণেই আমি জোরালোভাবে সমর্থন করি, যেকোন মহৎ জীবনের পক্ষে উচিত, ‘আত্মজীবনী’ নিজ হাতেই লিখে যাওয়া।

১৯৬৮ হতে ১৯৯৯ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মার্চের মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩১টি বছর ভারত বাসের মধ্যে ভদন্ত মহোদয়ের জীবনে স্বর্ণযুগ রচনার সকল সম্ভাব্য সুযোগ ছিল বুদ্ধগয়ায় থাই টেম্পলে অবস্থানকালে। পশ্চিম বিনাজুরী শ্মশান বিহারকে কেন্দ্র করে তিনি ১৯৬০ খৃস্টাব্দে যেই স্বপ্ন জাল বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা তিনি বুদ্ধগয়ায় বসে অনায়াসেই করতে পারতেন। ভারতীয় ভিক্ষু জগদীশ কাস্যপ তৎকালীন নালন্দার মতো একটি প্রত্যন্ত অজপত্তী অঞ্চলে নব-নালন্দার মতো মহাবিদ্যাপীঠের জন্ম দিয়ে আজ ভারতের বুকে অমর কীর্তির অধিকারী হলেন, তাঁর মূল শক্তির উৎস ছিলেন বুদ্ধগয়া থাই টেম্পলের সেই অধ্যক্ষ, যিনি আমাদের সোনার সন্তান মহাসংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্রকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু, বড়ুয়া সমাজের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, হতোদ্যম ভগ্ন হৃদয় নিয়ে প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগী ভদন্ত আনন্দমিত্র, মহাপ্রতিভাধর আনন্দমিত্র, অসাধারণ মেধাবী আনন্দমিত্র, বিশাল সৃজনশীল প্রতিভার আনন্দমিত্র সেই যে নিজেকে গুঁটিয়ে নিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করলেন, আর কোনদিন সেই কুকড়ে যাওয়া গোলাপ তাঁর পাপড়ি বিকশিত করলেন না।

কথায় বলে, ‘আদা শুকালেও ঝাঁজ যায় না’। মহাসংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র ও ঠিক তেমনি। প্রাতিষ্ঠানিক কিছু করার অদম্য স্পৃহা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন সত্য। অখিল ভারতীয় ভিক্ষুসংঘের মহানায়কত্বের আসন লাভ করেও সাংগঠনিক



কোন কর্ম উদ্যোগ ও তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু, তাঁর সংস্কার মুক্ত দৃষ্টির ক্ষুরধার লেখনি কোনদিন থেমে থাকেনি। তাঁর অন্তিম বয়সে তাই ‘আমার সমাজ’ নামক অমর কাব্যের পর দেখি আদর্শ বৌদ্ধ জীবন, সত্য-সাধনা এসকল রচনায়।

এই মহান জীবনটির সাথে আমার ব্যক্তি জীবনের কিছু অল্প মধুর স্মৃতি বিজড়িত আছে। তিনি ছিলেন আমার ভিক্ষুত্ব দীক্ষা দিনে উপসম্পদার সঙ্গীতি নায়ক। আবার আমার উপাধ্যায়ের শিক্ষাচার্য। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহারের বদ্ধসীমায় আমার উপসম্পদা কর্ম সমাপ্তির পর তিনি আমার মতো কলেজ পড়ুয়া উচ্চ শিক্ষিত যুবকের স্থায়ী উপসম্পদা গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে সেদিন সীমাঘরের চারপাশে দভায়মান জনতার উদ্দেশ্যে এক প্রাণবন্ত উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় ভক্তের বক্তব্য শুনতে শুনতে তখন আমি নিজের এই নবজন্মকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলাম। পরম আস্থাশীল হয়েছিলাম মহনীয় সাংঘিক জীবনটির প্রতি। মহৎ কিছু একটি করার সংকল্পে সত্য সত্যই আত্মপ্রত্যয়ী হয়েছিলাম এই মহাপুরুষের উৎসাহ প্রেরণায়। এই প্রতিবাদী সিংহ পুরুষের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধায় মস্তক চিরদিন আনত থাকবে।

পরিশেষে, গ্রন্থাকারের নিরোগ ধর্মময় জীবন ও “মহৎ জীবন ত্রিপিটক বাগীশ্বর আনন্দমিত্র” গ্রন্থটি বহুল প্রচার কামনা করি।

জয়তু ভদন্ত আনন্দমিত্র ! জয়তু সত্যের পূজারী !

প্রণত :

**প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো**

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ

মোগলটুলী শ্যামান ভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার

ও প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্যান কেন্দ্র।

তারিখ : ২৫৪৮ বুদ্ধবর্ষ

২৪শে নভেম্বর ২০০৪ ইং

গহিরা মহাশ্যামান ভাবনা কেন্দ্র

রাউজান, চট্টগ্রাম।

অধ্যক্ষ ও সভাপতি

বিশ্বশান্তি প্যাগোডা ও গোবিন্দ-গুনলংকার বৌদ্ধ ছাত্রাবাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

# আমার দু'টি কথা

প্রয়াত সাধক প্রবর ত্রিপিটক বাগীশ্বর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের পুত্র পবিত্র জীবনী লিখা আমার মত একজন সামান্য শিক্ষকের পক্ষে কতটুকু সম্ভব তা নিজেই ভেবে আকুল। তবে কেন এ দূরহ কাজে হাত দিয়েছি। আমাদেরই গ্রামের উদীয়মান তরুণ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, মোগলটুলি শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয়ের একান্ত প্রিয় শিষ্য আমার পরম হিতৈষী, গৃহীজীবনে আমার পরম আত্মীয় ও স্কুল জীবনে আমার ছাত্র “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ গ্রন্থ প্রকাশনী”র প্রতিষ্ঠাতা ভদন্ত বিপুল বংশ ভিক্ষু ও পূর্বগুজরা গ্রামের (জয় চাঁদের বাড়ী) কৃতি সন্তান, বিশ্বশান্তি প্যাগোডার উপাধ্যক্ষ ও আমার গৃহী জীবনের পরম স্নেহ ভাজন ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু উভয়েই বর্তমানে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। উভয়েই আমাকে বার বার অনুরোধ করেন যে, প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের জীবনী রচনা করার জন্য।

যেহেতু প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয় বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে অতীত এবং বর্তমানে যে কয়জন প্রতীতযশা বৌদ্ধ মনীষা ছিলেন এবং আছেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এহেন মহাপুরুষের জীবনী লিখা আমার পক্ষে কতটুকু সমীচীন তা আমার বিবেচনার বাহিরে। প্রয়াত ভন্তে পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের জন্মজাত সন্তান হলেও প্রব্রজিত হওয়ার পর তিনি স্বগ্রামের কোন বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেননি। তবে একথা সত্য যে, তিনি কখনও নিজ জন্ম-জনপদের কথা ভোলেননি। তিনি বিনাজুরী, বাগোয়ান, হতরপিটুয়া, বেতাগী, পাহাড়তলীসহ চট্টগ্রামের আরো অনেক বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেছেন, সময়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিজ গ্রামে আসতেন এবং ৪/৫ দিন অবস্থান করে গ্রামবাসীদের ধর্মসুখা বিতরণ করে আবার নিজ আবাসস্থলে চলে যেতেন। ভন্তে যখন আমাদের গ্রামে আসতেন, তখন প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় অনেক লোক জমায়েত হতো ভন্তেকে দর্শন ও একটু আলাপ করার জন্য। প্রতিদিন বিকাল ৫টায় ধর্মসভার আয়োজন হত। গ্রামের অন্যান্য ভিক্ষুসংঘ ও নর/নারী ধর্মসভায় যোগদান করতেন। ঐ ধর্মসভায় ভন্তে একক দেশনা করতেন। ভন্তের দেশনাকালীন সময়ে কোন সাড়া শব্দ থাকত না, শান্ত পরিবেশে সবাই অধীর আগ্রহে ভন্তের দেশনা শ্রবণ করতেন। দেশনার পর ভন্তে উপস্থিত ধর্মপ্রাণ নর/নারীর কাছে বলতেন যদি ধর্ম বিষয়ে

কারো কোন কিছু জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। তখন গ্রামের উপস্থিত সুধীজন বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন আর ভণ্ডে খুবই সরল সহজভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন।

তিনি ভিক্ষু জীবনের পাঁচ বৎসর কাটিয়েছেন শ্রীলংকায়, এক বৎসর মায়ানমার (বার্মা), মাঝখানে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বিহারে বর্ষাব্রত পালন করেন এবং ভারতের মাটিতেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন। যার ফলে প্রয়াত ভণ্ডের জীবনের অনেক কর্মকান্ড ভারতেই সংঘটিত হয়েছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও সুধীমহলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ফলে ভণ্ডের জীবনের অনেক তথ্য ও ঘটনাবলী আমার জানার বাহিরে।

এ পুস্তক রচনায় আমাকে বিশেষভাবে নানারকম তথ্যদি সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন পশ্চিম আধার মানিক নিগ্রোধারামের অধ্যক্ষ ত্রিপিটক বিশারদ ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাস্থবির। এছাড়াও নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত স্মরণিকা “আনন্দ সুরভি” তে ডঃ জিনেবোধি থেরো মহোদয়ের রচনা থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদি সংযোজন ও সংগৃহীত করা হয়েছে। এছাড়াও স্মরণিকা হতে বিভিন্ন লেখকের লিখা থেকে ও অনেক তথ্যদি সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাস্থবির ও ডঃ জিনেবোধি থেরো এবং অন্যান্য লেখকদের কাছে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রইলাম।

ভণ্ডের অন্তিম নিদ্রায় শায়িত দুটি ছবি আমাদেরই গ্রামের আমার স্নেহ ভাজন ভাগিনা শ্রীমান আনন্দমোহন বড়ুয়া নতুন দিল্লী থেকে এনে আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিল -যা বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ছবি দুটি বইয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাই তাকে আমার মৈত্রীময় আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি যেন সুখী ও উন্নত জীবন যাপন করে।

ভণ্ডের পূত পবিত্র জীবনী রচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বাদ পড়তে পারে। যেহেতু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভণ্ডে জীবনের অধিক সময় ভারতে কাটিয়েছেন সেহেতু অনেক ঘটনাবলী আমার অজ্ঞাত বিধায় বাদ পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়তো বলতেও পারবে না যে, আনন্দমিত্র মহাথের কে? তাঁর জন্মস্থান কোথায়? কেমন আদর্শবান ছিলেন? ভবিষ্যত প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে এবং ভণ্ডের জীবনাদর্শকে চিরজাগ্রত রাখার মানসে এ জীবনী রচনার উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশী বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু, মহামান্য সংঘরাজ ভদন্ত ধর্মসেন

মহাথেরো মহোদয় তাঁর মূল্যবান আশীর্বাণী দিয়ে গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন, তজ্জন্যে ভক্তকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা। অত্র গ্রন্থ সম্পর্কে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘ তাঁদের মূল্যবান অভিমত দিয়ে গ্রন্থটির মূল্য ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন। তজ্জন্যে তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করছি।

মোগলটুলী শ্মশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার এর প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডার অধ্যক্ষ, বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা পরম শ্রদ্ধেয় ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে থাকার পরও এ বইয়ের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে বইয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছেন। শ্রদ্ধেয় ভক্তের প্রতি চিরঋণী রইলাম এবং ভক্তের সুস্থ, নিরাময় ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করছি। “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী”র প্রতিষ্ঠাতাধ্বয় ভদন্ত বিপুলবংশ ভিক্ষু, ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু ও পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক বাবু ডাঃ দুলাল চন্দ্র বড়ুয়া, বাবু শাক্য কুমার বড়ুয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রেসের প্রুপ সংশোধনসহ যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন তাই তাঁদের নিকট চিরঋণী। আমার স্নেহভাজন ভাগিনা নান্টু বড়ুয়া গ্রন্থখানি প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমি তার চির মঙ্গলময় জীবন কামনা করি।

শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুসংঘ ও সমাজের জ্ঞানী-গুণী ও আপামর জনসাধারণের নিকট আমার একান্ত আবেদন, প্রয়াত ভক্তের জীবনের কোন মহৎ ঘটনা যদি বাদ পড়ে যায় দয়া করে আমাকে জানালে পরবর্তীতে তা সংযোজন করা হবে।

একজন আদর্শবান ভিক্ষুর জীবনী পাঠ করে যদি তাঁর জীবনের কিছুটা আদর্শ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলন করা যায়, তবেই হবে এ গ্রন্থ পাঠের সার্থকতা এবং আমার শ্রম ও সার্থক হবে মনে করি।

জগতের সকল মানুষ সত্যান্বেষী ও জ্ঞানী হউক।

ইতি

গ্রন্থকার

পশ্চিম আধার মানিক

রাউজান, চট্টগ্রাম।

তারিখ :

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৪১১ বাংলা

১০ই ডিসেম্বর ২০০৪ ইং

২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ।



প্রজ্ঞা ও বীর্য এ দুই মহাশক্তিই মানবের সর্বোন্নতির মূলে বিদ্যমান। জগতে যারা সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে বিজ্ঞানে ধর্মে বা যে কোন ও বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের সবার মধ্যে এ দুইটি শক্তিই প্রধান ছিল। প্রজ্ঞাচক্ষু সর্বদা ভালমন্দ সত্য-মিথ্যা ও সার-অসার দর্শন করে; আর বীর্য মন্দ মিথ্যা ও অসারকে বর্জন করে মানবকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ধাবিত করে। শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারত-বাংলা উপমহাদেশে যে কয়েকজন বিশিষ্ট জ্ঞানী সংঘ পুরোধাগণ সর্ব সাধারণের হিতের ও মঙ্গলের জন্য করুণাময় বুদ্ধের বিস্ময়কর ধর্মের স্বরূপ প্রচার করে গেলেন। তাঁদের মধ্যে সত্যসন্ধানী, বহুধা বিচিত্রগামী প্রতিভায ভাস্বর, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, ত্রিপিটক বাগীশ্বর, অভিধায় বিরল সম্মানে অধিষ্ঠিত, শীল বিনয়ের পরাকাষ্ঠায় কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত মাননীয় সংঘনায়েক পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো মহোদয় অন্যতম। জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে, তিনি যৌবনের উষালগ্নেই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য জীবন ধারণ করে, জীবনের সমস্ত বসন্ত জাতি, সমাজ, ধর্ম এবং শাসন সঙ্কর্মের জন্য তিলে-তিলে উজার করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মদেশনা। বাগ্মীতা, সুকণ্ঠের সূত্রপাঠ, দার্শনিক ব্যাখ্যাসমূহ ছিল উচ্চমাত্রার। এগুলি তাঁকে বহুউর্ধ্বে স্থান করে দিয়েছে। প্রতিকল্প দেশ শ্রীলংকা ও মায়ানমার (বার্মা) দীর্ঘদিন ধর্ম-বিনয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও তথাগত বুদ্ধের নৈর্বাণিক ধর্ম উপলব্ধি করায় লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘকাল গভীর অরণ্যে ধ্যান অনুশীলন করেন। সাধকরূপে যেমন তিনি স্বমহিমায় গৌরবনীয় তেমনি লেখক ও দেশকরূপে তাঁর সুখ্যাতি এখনো বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আছে।

বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া এই ত্যাগী মহাপুরুষের পুত্র জীবনী রচনার গুরু দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের সকলের প্রত্যাশা পূরণ ও দীর্ঘ দিনের একটা অভাবমোচন করলেন। আমি গ্রন্থকারের নিরোগ - দীর্ঘায়ু ও গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইতি-

অগ্গমহাসঙ্ঘসম্মজ্যোতিকাধ্বজ

**সত্যপ্রিয় মহাথের**

সভাপতি

বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা

অধ্যক্ষ

রামু সীমা বিহার।

## অভিষেক

অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের মহামান্য সংঘনায়ক, ত্রিপিটক বাগীশ্বর, সাধক প্রবর প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাস্থবির মহোদয়ের পুত্র পবিত্র জীবনী পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও আমার বিহারের বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া রচনা করে, “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীর” সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। যেহেতু প্রয়াত ভদন্ত ছিলেন বাংলা-ভারত উপমহাদেশের ভিক্ষুকুল গৌরব উজ্জ্বল রবি, সত্যের সাধক, সমাজ সংস্কারক। এহেন পুণ্য পুরুষের জীবনী প্রকাশ করা বর্তমান সমাজের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক বলে মনে করি। তাঁর পুত্র পবিত্র জীবনী পাঠ করে সমাজের প্রতিটি নর-নারী তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে ধর্মীয় ভাবধারায় গড়ে উঠুক প্রতিটি বৌদ্ধ পরিবার। আমি এ বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

ইতি-

-ভদন্ত কে. প্রিয়দর্শী মহাস্থবির  
(ত্রিপিটক বিশারদ)

অধ্যক্ষ

পশ্চিম আধার মানিক নিগ্রোধারাম  
রাউজান, চট্টগ্রাম।



বিশ্বজুড়ে আজ ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, দুর্বলের উপর সবলের হুংকার, কুৎচিৎ সমাজনীতি, ধর্মের অপপ্রচারের মাঝে যখন সাধারণ মানুষ দিশেহারা তখনই বৌদ্ধ জাতির জন্য সুখের সংবাদ যে। বিশ্বের অভিজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানীরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, পৃথিবীতে যদি কোন জাতি সুশৃঙ্খল ও শান্তিতে বসবাস করে তা হলো বৌদ্ধ জাতি। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম ও নীতিতে যেহেতু অপপ্রচারের কোন অবকাশ নেই সেহেতু বুদ্ধের বাণী ও আদর্শ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের কল্যাণকর।

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, তার মধ্যে দুর্লভ বৌদ্ধ জাতি, আমরা সেই গর্বিত বৌদ্ধ জাতি হিসাবে নিজেদের জীবনকে কি স্বার্থক করে নিতে পারি না? আমরা বুদ্ধের সেই আদর্শকে অনুস্মরণ করে সৎ কর্মের মধ্যদিয়ে মনুষ্য জীবনকে স্বার্থক করে নিতে পারি। যারা সৎ কর্ম করে মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের নীতি, কর্ম, আদর্শ অন্যদের মাঝে প্রচার করা ও ভাল কাজের একটা অংশ। এই মহৎ কাজে সহযোগীতা করতে পেরে আমি সত্য আনন্দিত। আমাদের সমাজে ভাল কাজের ও সুন্দর মনের মানুষের বড়ই অভাব। আমাদের জাতি, সমাজকে উন্নতর থেকে আরো উন্নতর করতে হলে যে সমস্ত জ্ঞানীগুণী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে এবং অন্যদের মাঝে তা প্রচার করতে হবে। তেমনি সু-চিন্তার সৎ সাহস দেখিয়েছেন আমার একান্তই শ্রদ্ধেয় মামা মাষ্টার অনিল কান্তি বড়ুয়া মহোদয়। ভারত-বাংলা উপমহাদেশের জ্যোতির্ময় সংঘপুরোধা, মহামান্য সংঘনায়ক প্রয়াত পরম শ্রদ্ধেয়

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের পুত্র জীবনী রচনা করে, আমার উপর প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়ে আমি আমার মামার উদ্দেশ্য সফল এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি। সেই সাথে গ্রন্থখানি জনসম্মুখে তুলে ধরার যে প্রয়াস “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীর” প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত বিপুলবংশ ভিক্ষু মহোদয় নিয়েছেন। তাঁর প্রয়াসকে শুধু স্বাগত জানালে খাটো করা হবে। জাতি এ গ্রন্থ থেকে শিক্ষা নিয়ে অগোছালো জীবনকে সাজিয়ে এ প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

পরিশেষে গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তে ও আমার শ্রদ্ধেয় মামা আমাকে কৃতার্থ করেছেন। সেই সাথে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থটি প্রিন্টিং, বাইন্ডিং সর্বোপরি সৌন্দর্য্য বন্ধনে ভূমিকা রেখেছে তাঁদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

গ্রন্থ কোন নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর নয়। কাজেই এই গ্রন্থটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবনের কল্যাণ বয়ে আনবে এই প্রত্যাশাই রাখি।

ইতি-

**নানু বড়ুয়া**

কাঝর দীঘির পাড়,

গুজরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

বর্তমান ঠিকানা ঃ শান্ত নীড়

বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।



# সাধক প্রবর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের পুত জীবন চরিত

জন্ম : ১৯০৮ ইংরেজী, ১লা ফেব্রুয়ারী - শনিবার

মহাপ্রয়াণ : ১৯৯৯ ইং, ৪ঠা মার্চ - বৃহস্পতিবার

## সূচনা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারত বাংলা উপমহাদেশে যে কয়জন ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ বৌদ্ধ গগনকে আলোকিত করে নব প্রেরণার সূচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাধক প্রবর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাঁর ধ্যান-ধারণা, পাণ্ডিত্য, গবেষণা বৌদ্ধ জগতের অমূল্য সম্পদ। সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, অনুবাদক, সাহিত্য ও দর্শনের লেখক হিসাবে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের গভী অতিক্রম করে তিনি হিন্দু-মুসলিম সমাজেও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। সেই একটি নাম আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের। তিনি আত্মত্যাগ ও আত্ম গুণাবলীর মাধ্যমে ভিক্ষুত্ব জীবনের সংযমতা, আদর্শ, নৈতিকতা ও দৃঢ়বীর্য পরাক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসাবে। সমাজের হীন পক্ষিলতার উর্ধ্বে থেকে তিনি কলুষতাপূর্ণ আবর্জনাকে ত্যাগ করার জন্য তাঁরই রচিত “আমার সমাজ ও সত্যসংগ্রহ” নামক গ্রন্থের মাধ্যমে বজ্রকণ্ঠে সিংহনাদে সমাজকে বহু উপমার মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করে একা সংগ্রাম করে গেছেন একজন বীর দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক হিসাবে।

## জন্ম পরিচিতি

সু-প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার পীঠভূমি হিসাবে পরিচিত। শুধু বৌদ্ধদের নয়, এ চট্টগ্রাম মুসলমানদের অনেক সাধক পীর আউলিয়া ও দরবেশের পীঠস্থান এবং হিন্দুদের অনেক সাধক ও সন্ন্যাসীর আবাসস্থল হিসাবে প্রসিদ্ধ। এহেন পুণ্যময় ভূমির মধ্যস্থানে অবস্থিত রাউজান থানাধীন পশ্চিম আধার মানিক গ্রাম। এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য

সংঘনায়ক প্রয়াত ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাথের, মায়ানমার আকিয়াব অঞ্চলের মহামান্য সংঘরাজ প্রয়াত ভদন্ত বিমলাচার মহাথের, অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের মহাসংঘনায়ক প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের, বিচিত্র ধর্মকথিক ভদন্ত সুধর্মানন্দ মহাথের, বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার ২৫তম সংঘনায়ক প্রয়াত পন্ডিত ভদন্ত জ্ঞানালোক মহাথের ও ভারতের বুদ্ধগয়াস্থ বাংলাদেশ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. গবেষক, অকালপ্রয়াত ধর্মদূত ভদন্ত বিবেকানন্দ থের, এম.এ (ডবল) প্রমুখ। তাঁদের জ্ঞান-গরিমায় ও ধর্মীয় প্রভাবে এ গ্রাম তথা উপমহাদেশের সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছিল। তাই এ গ্রামকে উপমহাদেশের পুণ্যময় তীর্থভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

### জন্ম

এহেন পুণ্যময় গ্রামের এক ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের আলোচিত মহাপুরুষ ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের। পিতা চরপ্র বড়ুয়া (কবিরাজ) ও মাতা দয়মন্তী বড়ুয়ার ঘরে এক শুভলগ্নে ১৯০৮ ইংরেজীর ১লা ফেব্রুয়ারী শনিবার ভূমিষ্ঠ হন। পুণ্য বিমন্ডিত শিশু। শিশুর আগমনে মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, সেদিন সবাই আনন্দে হয়েছিল উদ্ভাসিত। যেহেতু কবিরাজ চরপ্র বড়ুয়ার চার কন্যা সন্তানের মধ্যে এই শিশুই ছিল একমাত্র পুত্র সন্তান। পুত্রের নামকরণ দিবসে পিতা চরপ্র বড়ুয়া ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে নবজাত শিশু ও পরিবারের মঙ্গলার্থে সূত্রাদি শ্রবণ করলেন ও আত্মীয়-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে আহারের ব্যবস্থা করলেন। নবজাতকের চাঁদপনা মুখ দেখে সবাই খুব খুশী হলেন এবং শিশুর সুন্দর ও নিরাময় জীবন কামনা করে আশীর্বাদ করলেন। সেদিনই শিশুর নাম রাখা হয়েছিল যতীন্দ্র। অর্থাৎ ঋষিদের ইন্দ্র, তথা শ্রেষ্ঠ হবেন এই শিশুর এই আকাঙ্ক্ষা কি সেই নামাকরণে লুপ্তায়িত ছিল? (যতি+ইন্দ্র) অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মধ্যে ইন্দ্র বা দেবরাজ সদৃশ্য তা-ই কি কাল সত্য পরিণত হলো। শিশু যতীন্দ্র। পরবর্তীতে তাঁর নামের সার্থকতা বজায় রেখে আনন্দমিত্র নামে উপমহাদেশের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

## বাল্যকাল

শিশু যতীন্দ্র পিতা-মাতা ও প্রতিবেশীদের স্নেহ-মমতায় দিন দিন চন্দ্রকলার মত বড় হতে লাগল। শিশুর আদুরে চেহারা ও মিষ্টি হাসি দেখে সবাই চায় একটু কোলে নিতে, আদর করতে। হাত বাড়ালেই কোলে ঝাপিয়ে পড়ে। তাই তাকে সবাই আদর করে, চুমু দেয়। শিশু যখন হাঁটি হাঁটি পা পা এক আধটুকু কথা বলতে শিখে, তখন থেকেই তার শিশু সুলভ স্বভাব অন্যসব শিশুদের মত ছিল না। সে সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসত। এ শিশুর স্বভাব, চলার গতি যেন সবারই মনমুগ্ধকর। এহেন বয়সে সে তার মার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যায় বন্দনা করতে বসে যেত। তখন থেকে ধর্মের প্রতি তার অনুরাগ। অন্যসব শিশুদের ন্যায় মাকে বিরক্ত করা, হঠাৎ কোন জিনিষের জন্য বায়না ধরা, কান্না-কাটি করা, এসকল শিশু যতীন্দ্রের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। মা অত্যন্ত যত্নের সাথে তার ভবিষ্যত জীবন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মনে মনে। শিশু এখন বাড়ীতে বই নিয়ে মার পাশে বসে থাকে। মা যতদূর পারে শিশুকে পড়তে সাহায্য করে। এভাবে শিশু যতীন্দ্রের বাল্যকাল মার সাথেই কাটে।

## শিক্ষা জীবন

শিশু যতীন্দ্র এখন পাঁচ/ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছে। তাকে এখন বিদ্যালয়ে পাঠানোর উপযুক্ত সময় চিন্তা করে মা একদিন তাকে নিয়ে গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য গুরু মহাশয়ের নিকট সাক্ষাৎ করলেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যতীন্দ্রের পিতা গ্রামে বেশিদিন থাকতেন না। তিনি আকিয়াবের চেরীপোক্ত শহরে কবিরাজী ব্যবসা করতেন। তাই যতীন্দ্রকে নিয়ে মা স্কুলে গিয়েছিলেন। তখন ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন গ্রামের স্বনাম ধন্য পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া। ধর্মরাজ বড়ুয়াকে দেখতে সত্যিকার একজন ঋষির মতন দেখাতো। দীর্ঘদেহ, লম্বাচুল, লম্বাদাঁড়ি, ফর্সা রং, পরণে ধূতি, গায়ে পাঞ্জাবী, তার উপর চাদর সব মিলে তাকে একজন আদর্শ শিক্ষা গুরু হিসাবে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নোয়াইয়ে পড়ত। ধর্মরাজ বাবু ছিলেন একজন আদর্শ বৌদ্ধ গৃহী। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন। এহেন আদর্শবান শিক্ষাগুরুর নিকট হাতেখড়ি হয় শিশু

যতীন্দ্রের। শিশু যতীন্দ্র প্রতিদিন স্কুলে যায়। শ্রেণীর পড়া আদায় করে। স্কুলে যেতে শিশু যতীন্দ্রের খুব আনন্দ লাগে। সে স্কুল কামাই করে না। বিদ্যালয়ে শিশুর সাধারণত শিক্ষকের অবসরের ফাঁকে নানা রকম হৈ-চৈ করে, সময় কাটায়। কিন্তু শিশু যতীন্দ্র শ্রেণীর অন্যসব শিশুর মতন হৈ-চৈ না করে নিভূতে এক জায়গায় বই নিয়ে বসে থাকত। শিশু যতীন্দ্রকে শ্রেণীর কোন একটা পাঠ একবার পড়ালেই সে তা সহজেই আয়ত্ত্ব করতে পারত। শিক্ষাগুরু ধর্মরাজ বাবু তার মেধা, স্বভাব ও চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন এই শিশু কালে সুনামের অধিকারী হবে। তাই তিনি যতীন্দ্রের প্রতি অধিক যত্নবান হলেন। যতীন্দ্রকে তিনি নিজ বাড়ীতে এনে পড়া শোনার ব্যবস্থা করলেন। অংক শাস্ত্রে তার অধিক মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যতীন্দ্র যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন সে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাটিগণিতের অংকগুলো কষতে পারত। যোগ্য গুরু যোগ্য শিষ্য পাওয়ায় তাঁকে মনমতো করে শিক্ষাদান করেছিলেন বলে যতীন্দ্রের শিক্ষা জীবন ভবিষ্যত উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়েছিল। গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে যতীন্দ্র ভীষণ চিন্তায় পড়ল। কেননা আশে-পাশের কোন গ্রামে তখন মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় বা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তখন গ্রামে বিদ্যার্থীও ছিল খুব কম। একেবারে নাই বললেও চলে। নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। অনেক ভেবে চিন্তে বালক যতীন্দ্র বিনাজুরী এম.ই স্কুলে ভর্তি হল। সেখানে দু'বৎসর অধ্যয়ন করে যথেষ্ট মেধার পরিচয় দিয়েছিল। শিক্ষক মন্ডলী তার স্বভাব, চরিত্র ও মেধার পরিচয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাকে আর ধরে রাখা যায়না। সেখানে আর পড়ার শ্রেণী নেই বিধায় তাকে নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হল। এখানে ও তার কোন সংগী ছিল না। তখন গ্রামের রাস্তাগুলো ছিল বর্তমানের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ। পায়ে না হেঁটে আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বর্ষার মৌসুমে রাস্তাগুলো কাদায় পরিপূর্ণ। তাছাড়া মাঝে মাঝে রাস্তা ভাঙ্গা, বাঁশের সাকোঁ, এভাবে তাকে প্রতিদিন স্কুলে যেতে আসতে প্রায় ৩ মাইল পায়ে হেঁটেই যেতে হত। ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, রোদ সবকিছু উপেক্ষা করে একাই নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতো। সেখানেও তার মেধা, স্বভাব ও চরিত্র লক্ষ্য করে শিক্ষকগণ তার উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। তখন থেকে সে ছিল খুব স্বাধীন চেতা, তেজস্বী ও

দৃঢ়সংকল্পী। ছোটবেলা থেকে মিথ্যা বলাকে নিন্দা করতো। প্রতিদিন সকাল-বিকাল পঞ্চশীল গ্রহণ, বুদ্ধ বন্দনা ও ফুল বাতি দিয়ে বুদ্ধপূজা করা ছিল তার প্রাত্যহিক কাজ। ছোটবেলা থেকেই দৃঢ়ভাবে পঞ্চশীল রক্ষা করতো। ছাত্রাবস্থাতেই সে স্থানীয় নিম্নোদ্যোগে থাকতো এবং সেখানেই লেখাপড়া করতো। নিম্নোদ্যোগে লেখাপড়া করার সময় সে স্থানীয় পাড়ার ছেলের ডেকে এনে লেখাপড়ার জন্য উৎসাহ দিতো এবং নিজে পড়তো। প্রতিদিন খুব ভোরে এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় শাসানে গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করা ও নীরবে বসে থাকা ছিল আর একটা প্রাত্যহিক কাজ।

একদিনের একটি ঘটনা। সে সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বিহারে আসতেছে। পুকুরে হাত মুখ প্রক্ষালন করবে মনস্থ করে ঘাটে নামলে এমনি সময়ে একটি বড় কাতলা মাছ তার সামনে লাফিয়ে পুকুরের পাড়ের উপরে উঠে গেল। সে কোন চিন্তা না করেই মাছটিকে পুনরায় জলে ফেলে দিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে ছাত্রাবস্থাতেই কতটুকু শীলবান ছিল।

### বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান

তিনি যখন নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতেন তখন মাস্টারদা সূর্যসেন গঠন করেছিলেন “বৃটিশ বিরোধী” বা “স্ব-দেশী আন্দোলনের দল। কিশোর যতীন্দ্র বৃটিশের অত্যাচার ও ধ্বংস যজ্ঞের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য ১৯২৬ ইংরেজী সনে ঐ দলে যোগদান করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। অন্যায়ের নিকট মাথা নত করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে ও তাঁর দেশনা এবং বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি যে স্বাধীনচেতা ছিলেন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের একজন সাহসী, নির্ভীক সদস্য, অন্যদিকে একজন কৃতি ছাত্র। “ছাত্রাঙ্গ অধ্যয়ন তপঃ” এমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মনযোগ সহকারে লেখাপড়া করেছেন। ১৯২৮ ইংরেজী সনে তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশ করেন। যতীন্দ্রের ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই খুব খুশী হল। দলে দলে লোকজন এসে যতীন্দ্রকে

আশীর্বাদ করে গেল। পিতা-মাতার তখন আনন্দের সীমা নাই। তাদের একমাত্র ছেলে পরীক্ষায় পাশ করেছে। তখন এ গ্রামের শিক্ষিতের হার খুব কম ছিল।

### ম্যাট্রিক পাশের পর

ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে না পেয়ে শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার পরামর্শে রাউজানের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু-বৎসর শিক্ষকতা করেন। সেখানে স্থানীয় যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে ক্লাব গঠন করেন। উক্ত ক্লাবের সদস্যদের তিনি শরীর চর্চা শিক্ষা দিতেন এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে যোগদান করতেন। সেখানে একবার কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। প্রতি বাড়ীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় কেহ কোন বাড়ীতে যাওয়ার সাহস করত না। কোন রোগীকে সেবা যত্ন ও ঠিকভাবে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করানোর লোকও ছিল না। এ বিপদের সময় তিনি সাহসের উপর ভর করে এগিয়ে এলেন রোগীদের সেবা করার জন্য। প্রথম দিন ক্লাবের একজন সদস্যকে নিয়ে রোগীর সেবা করলেন - পরদিন ঐ সদস্য না আসায় তিনি একাই রোগীদের সেবা করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে রোগীর সেবা কার্যে রত থাকা অবস্থায় এক রাত্রে তিনি নিজেও ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বেশীদিন রোগাক্রান্ত ছিলেন না। অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেন। এভাবে তার সেবা কার্যে সবাই সম্মত হলেন এবং রাউজানে তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন।

### যতীন্দ্রের ভবিষ্যত কর্ম নির্ধারণ

পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পরীক্ষায় ও ভাল পাশ করেছে। এখন তার ভবিষ্যত নিয়ে কিছুটা ব্যতিব্যস্ত হলেন পিতা চরপ্র বড়ুয়া। তিনি একজন কবিরাজ। তাই তার ছেলেকে ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছা পোষন করলেন মনে মনে। তাদের সাংসারিক অবস্থাও সচ্ছল। তাঁর লেখাপড়ার ব্যয়ভার নির্বাহ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তাই তাঁকে বাল্য শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়ার সাথে রেঙ্গুনে পাঠান মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। রেঙ্গুনে এসে প্রথমেই রেঙ্গুনের বিখ্যাত “বড় ফয়া” বা “সোয়েডাগন ফরা” দর্শন করে, তাঁর মনে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হয়। কারণ

সোয়েডাগন ফয়াতে এত দর্শনীয় বস্তু রয়েছে যে, একবার দেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়। কিছুদিন রেঙ্গুনে অবস্থান করে যোগ্য অভিভাবকের পরিচয় পত্রের অভাবে তিনি মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে পুনরায় দেশে ফিরে আসেন।

### বৈরাগ্য ভাবের উদয়

রেঙ্গুনের বিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডা দর্শন ও সেখানকার ভিক্ষুদের নীতি-শৃংখলা ও ব্রহ্মদেশের জন সাধারণের মনে ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখে, তাঁর মনে বৈরাগ্য ভাবের সৃষ্টি হয়। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন ধর্মভীরু, পাপে বিরত, শীল রক্ষাকারী ও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই সংসারের মায়া মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। গৃহী জীবন থেকে যে প্রব্রজ্যা জীবন অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্ব, তা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন রেঙ্গুনে এসে। সংকল্প করলেন মাতা-পিতা যদি তাঁর সিদ্ধান্তে বাধা প্রদান করেন, তাহলে তাঁদের শত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে নিজ সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকবেন।

### প্রব্রজ্যা লাভের দৃঢ় সংকল্প ও মাতা-পিতার অনুমতি

মাতা-পিতার একমাত্র আদুরে সন্তান। অনেক আশা ভরসা ও ছেলের ভবিষ্যত কর্ম নির্ধারণ করে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন রেঙ্গুন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারীতে ভর্তি হবার জন্য। কিন্তু পিতা-মাতার সে আশা আর পূরণ হল না। যতীন্দ্র অর্থকরী বিদ্যা অর্জনের জন্য বিশেষ প্রত্যাশী নয় বিধায় মাতা-পিতাকে প্রব্রজ্যা জীবন লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পিতা-মাতা তাদের একমাত্র আদুরে সন্তানকে প্রব্রজিত হবার জন্য অনুমতি দিলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতির পর ও যখন পিতা-মাতা রাজী হলেন না, তখন তিনি যে স্বরাজী আন্দোলনের সদস্য এবং পুলিশের খাতায় তাঁর নাম রেকর্ড ভুক্ত করা হয়েছে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করলে হয়ত তাঁকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খাটতে হবে; -এ কথা পিতা-মাতাকে ভালভাবে বুঝিয়ে বললেন। সত্যিই পুলিশের খাতায় স্বদেশী আন্দোলনের নথিভুক্ত ছিল তাঁর নাম। পিতা-মাতা এখন উভয় সংকটে পড়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁরা অনেক

ভেবে চিন্তে তাঁকে প্রব্রজ্যা লাভের অনুমতি প্রদান করলেন। পূর্ব জন্মের অসংখ্য পুণ্য প্রভাব যার অন্তরে বিদ্যমান, তাঁকে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ রাখা যায় না। সংসারের মায়াজালে ছিন্ন করে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি একদিন ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন।

### প্রব্রজ্যা লাভ

১৯৩০ সালের মে মাসে প্রব্রজ্যা লাভের দৃঢ় মনোবল নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকাননস্থ বৌদ্ধ বিহারে। তখন ঐ সময় বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির। শ্রদ্ধেয় ভক্তের নিকট তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলে ভক্তে তাঁকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁর বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল এবং বৌদ্ধগগনে ঘোষিত হল এক মহাজ্যোতিষ্কের নাম ‘আনন্দমিত্র’। সূচনা হল এক মহাজীবনের। গুরুদেবের স্নেহ সান্নিধ্যে তিনি এক বৎসর ধর্ম বিনয় শিক্ষা করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার শুরু থেকেই তিনি প্রত্যহ দুই মাইল দূর থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনতেন। তখন শহরের কোলাহল মুখর জীবন তাঁর মনপূত না হওয়ায় এক বৎসর পর তিনি গুরুদেবের অনুমতিক্রমে কর্তালায় চলে যান।

### কর্তালায় গমন

১৯৩১ সালে তিনি কর্তালার সদ্ধর্মলংকার বিহারের অধ্যক্ষ বিনয়াচার্য ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয়ের নিকট গমন করেন। মহাস্থবির মহোদয় এই তরুণ উদীয়মান শ্রামণের ধর্ম বিনয়ের প্রতি গৌরব, গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও গৌরব প্রদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি তাঁকে পুনরায় শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করে, নাম করণে পূর্বের নাম ‘আনন্দমিত্র শ্রামণেরো’ বহাল রাখলেন। সেখানে তিনি গুরুদেবের সান্নিধ্যে এক বছর ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করেন।

### পিতৃবিয়োগ

কর্তালায় অবস্থানকালে ১৯৩১ সালে আকস্মিকভাবে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে।



পরিবারের একমাত্র সন্তান হওয়ায় বিধবা মা, দুই অনুঢ়া বোন এবং পরিবারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব তাঁর উপরই নির্ভর করে। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাঁকে প্রব্রজ্যা ত্যাগের উপদেশ দিতে থাকেন। তিনি তাঁর সংকল্পে অটুট থেকে দৃঢ় বীর্য সহকারে সবার কথা শুনতে লাগলেন। তাঁর গুরুদেব পূজ্য ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবিরের নিকট একথা প্রকাশ করলে তিনি প্রব্রজ্যা জীবনের সার্থকতা ও গৃহী জীবনের কলুষতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তাঁকে স্নেহ মাখা উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করেন।

### ভিক্ষু উপসম্পদা লাভ

আচার্য বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয় তরুণ শ্রামণের জ্ঞানস্পৃহা, ত্রিরত্নে গৌরব ও ধর্ম শাস্ত্র বিষয়ে জানার আগ্রহ দেখে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ মানসে উন্নত ভিক্ষু জীবন যাপনের জন্য তাঁকে নিয়ে ১৯৩২ সালে আকিয়াব গমন করেন। আচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের অনুমতিক্রমে ১৯৩২ সালের ২০শে মার্চ তারিখে আকিয়াবের ডাঙম সীমায় ডাঙম ছেয়াদ বর মহাস্থবিরের উপাধ্যায়াত্বে অনেক ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতে ২৫ বৎসর বয়সে তাঁকে শুভ ভিক্ষু উপসম্পদা দেওয়া হয়। এবার শ্রামণ “আনন্দমিত্র” আনন্দমিত্র ভিক্ষুরূপে উন্নীত হলেন। তাই তাঁর দায়-দায়িত্ব ও সংযম বহুগুণে বেড়ে গেল। উপসম্পদার পর তিনি গুরুদেবের সংগে দেশে চলে আসেন।

### চরকানাই রত্নাকুর বিহারে ১৯৩২-৩৪ সাল

গুরুদেবের নির্দেশে তিনি ১৯৩২ সালে চরকানাই রত্নাকুর বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেন। চরকানাই বিহারে তিনি তিন বর্ষা যাপন করেন। সেখানে তিনি ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করতেন। তাঁর নৈতিক চারিত্রিক মাধুর্যে ও ধর্মদেশনায় সেখানকার জনগণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ও ধর্মের নব প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন।

### পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ

১৯৩৩ সালের মার্চ মাস, ভিক্ষু আনন্দমিত্রের জীবনে এক অবিস্মরণীয় বছর। এ

বছরই প্রখ্যাত ইটালিয়ান ভিক্ষু লোকনাথ (আমাদের দেশের লোকে “সাহেব ঠাকুর” বলত) মায়ানমার ও শ্রীলংকা থেকে পঞ্চাশ জন ভিক্ষু নিয়ে রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা থেকে পদব্রজে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান চট্টগ্রামে আসেন। লোকনাথ ভিক্ষু শুধু একজন পরিব্রাজক ছিলেন না; বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি স্থানে স্থানে গিয়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামে ধর্মদেশনা করতেন। লোকনাথ ভিক্ষুর ধর্ম দেশনা শুনে তরুণ ভিক্ষু আনন্দমিত্র মুগ্ধ হয়ে তাঁদের সাথে ধর্মাভিযানে যোগদানের জন্য মন-বাসনা ব্যক্ত করলেন। লোকনাথ ভিক্ষু সহজে কাহাকেও সঙ্গী করতেন না। কোন লোক তাঁর সাথে আলাপ করতে ইচ্ছা করলে, প্রথমে তিনি তার পরিচয় জানতে চাইতেন এবং মনোভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য করে তার সাথে আলাপ করতেন। তারপর ভিক্ষু আনন্দমিত্র শাকপুরায় এসে তাঁদের সাথে ধর্মাভিযানে যোগ দেন এবং এক শুভ মুহূর্তে তাঁরা ধর্মাভিযানে যাত্রা করেন। পদব্রজে যাত্রার সময়ে তাঁরা পথিমধ্যে সীতাকুন্ড, ভোলানাথ গিরির আশ্রম, ফেনী কলেজ, গোয়ালন্দের রাজবাড়ী ও রানাঘাট প্রভৃতি স্থানে ধর্মালোচনা ও দেশনা করেছেন। এই অভিযানে তাঁরা দৈনিক একবার মাত্র নিরামিষ আহার করে ১৫/২০ মাইল হেঁটেছিলেন। পথে সর্বত্র ভিক্ষা ও সুলভ ছিল না, তাই কোন কোনদিন চিড়া, মুড়ি খেয়েই দিন কাটাতে হয়েছে, পথিমধ্যে হয়ত কোন বিদ্যালয়ে, না হয় উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রি যাপন করতে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাঁরা অনেক বিদ্বান পণ্ডিতের সাথে আলাপ আলোচনা করে বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। প্রথমে তাঁরা কলিকাতায় পৌঁছেন। সেখান থেকে তাঁরা বর্ধমান হয়ে বুদ্ধগয়া, রাজগীর, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেন। এত কষ্টের মধ্যেও পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণে তিনি হতোদ্যম হননি; বরং বেশ আনন্দ উপভোগ করেছেন। প্রায় দুই মাসের অধিক ভ্রমণ শেষে তিনি পুনরায় চরকানাই রত্নাকুর বিহারে চলে আসেন। লোকনাথ ভিক্ষু ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় মায়ানমার চলে যান।

### কর্তৃলায় - ১৯৩৫ সাল

১৯৩৫ সালে কলিকাতার ধর্মাংকুর বিহার কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা বিশেষ

করে এশিয়ার প্রথম ডি,লিট, ডিগ্রী প্রাপ্ত ডঃ বেনী মাধব বড়ুয়ার সাদর আমন্ত্রণে উক্ত বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবির কলিকাতা চলে যান। গুরুদেবের নির্দেশে তিনি চরকানাই ত্যাগ করে কর্তালা সঙ্ঘর্ষলংকার বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেন।

এখানে তিনি প্রতিদিন বিকালে ধর্মসভার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর দেশনার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করেছিলেন। প্রতিদিন সকাল ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১টা হতে ৫টা পর্যন্ত ১০/১১ জন ভিক্ষু-শ্রামণকে ইংরেজী, বাংলা, অংক ও পালি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিতেন। প্রতিদিন সকাল ৯টার সময় ২জন বালক সঙ্গে নিয়ে সকলের জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনতেন। রাত ২টা হতে ৪টা পর্যন্ত ভাবনা করতেন। ৪টার পর ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি কর্তালায় এক বৎসর কাটান।

### আকিয়াবে - ১৯৩৬ সাল

কর্তালায় এক বৎসর অতিবাহিত করার পর জীবনে শান্তি পাওয়ার আশায় তিনি ১৯৩৬ সালে পুনরায় আকিয়াব চলে যান। সেখান তিনি এক মগ ভিক্ষুর সঙ্গে পোত্তলি মহাশ্মশানে প্রথমে খোলা বিশ্রামশালায় ও পরে এক পর্ণকুটিরে প্রায় সাত মাস অতিবাহিত করেন।

এরপর তিনি চারিপোক্ত মহাশ্মশানে ছায়াবিহীন ছোট এক গাছ তলে ছাদশূন্য ছাটাই দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় মাসাধিক সময় কাটান। এ সময় তিনি শ্মশানিক, ত্রিচীবর পিণ্ডপাতিক ও একাসনিক বিভিন্ন ধূতাপ্ত ব্রত পালন করেন। জলের অত্যাধিক অসুবিধার দরুণ তিনি পুনরায় পোত্তলি মহাশ্মশানে চলে আসেন।

এ সময় তাঁর পূর্ব পরিচিত লোক নাথ ভিক্ষু পাথরকিল্লা অরণ্যাশ্রমে বাস করতেন। তিনি ভদন্ত আনন্দমিত্রের খবর পেয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে ভিক্ষু আনন্দমিত্র পাথরকিল্লা অরণ্যাশ্রমে গমন করেন। সেখানে ও ধূতাপ্তব্রত পালন করেন। এবং এক চীনা শ্রামণের সাথে এক বর্ষা যাপন করেন।

আকিয়াবের পোত্তলি মহাশ্মশান, চারিপোক্ত মহাশ্মশান এবং পাথরকিল্লা অরণ্যাশ্রম তিনটাই লোকালয় থেকে অনেক দূরে। জনমানবহীন গভীর অরণ্য হিংস্র স্বাপদসংকুল বন্য প্রাণীর ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে তিনি নিজ কর্তব্যে অটুট

ছিলেন। প্রতিদিন ৭/৮ মাইল পথ হেঁটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে একাসনে আহার করে জীবন যাপন করেছেন। তখন ছিল বর্ষার মৌসুম। আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিন ঘন ঘন বৃষ্টি, সূর্যের মুখ প্রায়ই দেখা যেত না। এমনি অবস্থায় ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে। পরিধানের চীবর সিন্ত অবস্থাতেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে প্রায় সময়ে। এতসব কষ্টের মধ্যেও তিনি স্বীয় কর্তব্য থেকে চ্যুত হননি। এতেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিরাগ ও ত্যাগময় প্রীতি সুখ।

### ছতর পিটুয়া পর্ণকুঠিরে - ১৯৩৭-৪১ সাল

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে তাঁর অসহায়া মা তাঁকে দেশে ফিরে আসতে আহ্বান জানালে, ১৯৩৭ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এ সময় ছতর পিটুয়া নিবাসী অধ্যাপক সুরেন বাবুর সাদর আহ্বানে তিনি ছতরপিটুয়া গমন করেন। সেখানে তাঁর নির্দেশে এক পাহাড়ের শীর্ষ দেশে এক পর্ণ কুঠির নির্মাণ করা হয়। এ পাহাড় অত্যন্ত ভয়াবহ। এখানে ছিল বাঘ, হাতী, হরিণ, সাপ, শৃগাল, বন্য কুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হিংস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল। এরূপ ভয়াবহ হিংস্র প্রাণীর ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি পাঁচ বৎসর তথায় অতিবাহিত করেছেন। এখানেও তিনি ধৃতাজ্জ ব্রত পালনার্থে প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে একাসনে ভোজন করে জীবন যাপন করতেন। তাঁর মৈত্রী প্রভাবে বনের হিংস্র প্রাণী সমূহ একত্রে বসবাস করত। আহারের ভূক্তাবশেষ সমূহ যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতেন তখন বনের নানা প্রকার পশু-পাখী কোন বিবাদ বিসংবাদ ছাড়াই আহার করে চলে যেত।

এখানে তিনি মাঝেমধ্যে বিকাল বেলায় ধর্মদেশনা করতেন। তাঁর মৈত্রীময় ধর্মদেশনা শুন্যর জন্য সে অঞ্চলের বহু গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই তাঁর পর্ণ কুঠিরে সমবেত হত।

ছতর পিটুয়ার পর্ণ কুঠিরে অবস্থানকালে ধ্যানরত অবস্থায় তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে উল্লেখ করতেছি। একদা গভীর রাতে ভক্ত ধ্যানে মগ্ন, এমতাবস্থায় এক বন্য হস্তী এসে তাঁর পর্ণ কুঠির খানি ভেঙ্গে দিয়ে যায়। পরদিন সকালে এ ঘটনা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক ভক্তকে

দেখতে আসেন এবং তাঁর কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করেন। ভন্তে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তোমাদের এত ব্যতিব্যস্ত হবার কোন কারণ নাই। হাতীর কাজ হাতী করেছে। এতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। আমি সুস্থ আছি। এ ঘটনা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। তাই অনেক দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে ভন্তেকে দেখতে এসেছিল অনেকেই। সবাই ভন্তের ধ্যানের মহিমা দেখে অবাক হয়ে গেল।

### বাগোয়ানে ১৯৪২-৪৭ সাল

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিক্রম করার পর ছতরপিটুয়া অরণ্যাশ্রম থেকে বাগোয়ান ফরাচিং বিহারের কয়েকজন বিশিষ্ট দায়কের সাদর আহবানে তিনি ১৯৪২ সালে বাগোয়ান ফরাচিং বিহারে চলে আসেন। সু-প্রাচীন কাল থেকে বাগোয়ান ফরাচিং বিহার বৌদ্ধদের একটি তীর্থস্থানরূপে পরিচিত ছিল। এ বিহারের পূর্ব ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি গ্রামবাসীদের মধ্যে ধর্মানুভাব জাগ্রত করেন। দলমত নির্বিশেষে সবাই ভন্তের অনুগত হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সকলের মধ্যে সখ্যতা ভাব আনয়ন করে বিহারের উন্নতি সাধন করেন। এখানেও তিনি প্রতিদিন বিকালবেলা ধর্মদেশনা করতেন। গ্রামের সকলে ভন্তের মৈত্রীপূর্ণ মধুময় ধর্মদেশনা শ্রবণ করে প্রীতি লাভ করতেন। এ বিহারে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর বর্ষাবাস যাপন করেন।

### বেতাগী বনাশ্রমে - ১৯৪৮-৫১ সাল

১৯৪৮ সালে তিনি বাগোয়ান থেকে পাশ্ববর্তী গ্রাম বেতাগী চলে আসেন। প্রকৃতির লীলাভূমি বেতাগী গ্রাম। এ গ্রামের দক্ষিণ দিকে খরস্রোতা কর্ণফুলী নদী কুল কুল রবে প্রবাহিত হচ্ছে। গ্রাম ানিকে ঘিরে রেখেছে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়ের চূড়ায় বনাশ্রমে তিনি দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত করেন। কালক্রমে ঐ পাহাড়ে একটি বুদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পাহাড়ও নিরাপদ নয়। এখানে রয়েছে বন্য হাতী, বাঘ, সাপ, শৃগাল ও নানা রকম হিংস্র প্রাণী। সব ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে তিনি একাই ঐ বনাশ্রমে কাল যাপন করতেন। এখানে ও তিনি প্রতিদিন দেশনা করে গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করেন।

### যোগান্দ্রারামে - ১৯৫২-৫৩ সাল

১৯৫২ সালে তিনি বেতাগী বনাশ্রম থেকে পাহাড়তলী মহামুনি যোগান্দ্রারামে চলে আসেন। সেখানে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনার প্রচলন করেন। উপাসনায় শতাধিক নর-নারী অংশগ্রহণ করতেন। উপাসনার পর তিনি ধর্মদেশনা করতেন। প্রতিদিন তিনি ত্রিরত্নের বাণী ও অনুরূপভাবে দেশনা করতেন। এভাবে তিনি মহামুনি গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন।

### আকিয়াবে ও রেঙ্গুনে - ১৯৫৪ সাল

১৯৫৪ সালে বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে মায়ানমারের রাজধানী রেঙ্গুন শহরে ৬ষ্ঠ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য তিনি বার্মা সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথম তিনি আকিয়াব বিমান বন্দরে অবতরণ করলে স্ব-গ্রামের ভদন্ত পূজ্য বিমলাচার মহাস্থবির প্রমুখ কয়েকজন দায়ক তাঁকে স্বাগত জানান। সেখানে তিনি পূজ্য বিমলাচার মহাস্থবিরের পূর্ণ কুঠিরে অবস্থান করেন। আকিয়াব শহর তাঁর নিকট নূতন নয়। অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই আকিয়াব শহর। এখানে ক্রমেই তাঁর অতীত স্মৃতিগুলোর কথা বার বার মনে দোলা দেয়। তাই তিনি পূর্ব পরিচিত ধ্যান সাধনার স্থানগুলো দর্শন করে বিপুল প্রীতিসুখ লাভ করেন।

আকিয়াবে প্রজ্জালোক মিশন স্কুলে প্রজ্জালোক মিশন কর্তৃক আয়োজিত এক মহাসমাবেশে তিনি ধর্মদেশনা করেন। তাঁর ধর্মদেশনা শুনে উপস্থিত সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর “চট্টল বৌদ্ধ সমিতি” কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় তিনি জাতি ও সমাজের অবক্ষয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সপ্ত অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন। চট্টল বৌদ্ধ সমিতি ও প্রজ্জালোক মিশনের কর্মচারীদের যৌথ উদ্যোগে তাঁকে অভিনন্দনের মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। আকিয়াবে মাত্র ১৫ দিন অবস্থানের পর তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করেন।

রেঙ্গুন বিমান বন্দরে পৌঁছলে স্বগ্রাম নিবাসী ডাক্তার রাজকমল বড়ুয়াসহ ১৫/

২০জন উপাসক-উপাসিকা তাঁকে স্বাগত জানান। বিমান বন্দর থেকে তাকে কান্দগ্নে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত ধর্মদূত বিহারে নিয়ে যান। সেখান থেকে তিনি সংগায়নে যোগদান করেন। তাঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বার্মা সরকার তাঁকে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য পাঁচ বছরের বৃত্তি প্রদান করেন। বার্মা সরকারের সৌজন্যে তিনি পাঁচ বছর ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন। সংগায়ন শেষে তিনি অন্যান্য বিশিষ্ট কয়েকজন প্রতিনিধিদের সাথে বিমানযোগে মেডেলে, চেগাইন, পাগান প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন ও পূজা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ধার্মিক উপাসকের বদান্যতায় প্রোম ও পেতুর দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন ও পূজা করার সুযোগ লাভ করেন।

বার্মায় অবস্থানকালে তিনি সেখানকার কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাস্থবিরের সাথে ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হন। বার্মায় তিনি অনেক দিন অতিবাহিত করার পর, বার্মা সরকারের প্রদত্ত বৃত্তি নিয়ে শ্রীলংকায় গমন করেন।

### শ্রীলংকায় ১৯৫৪-৫৯ সাল

বার্মায় সংগায়নের কার্যাদি সমাপ্ত করে তিনি ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথমে কলিকাতা ও পরে মাদ্রাজ হয়ে ১২ই জুলাই শ্রীলংকায় পৌঁছেন। সেখানে তিনি কলম্বোর ধর্মকীর্তি আরামে অবস্থান করে তিন মাইল দূরে এক কলেজে ধর্ম শিক্ষা আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন নির্জন প্রিয়, কোলাহল পূর্ণস্থান তাঁর অরুচি। তাই তিনি শহরের গঞ্জনা হতে মুক্ত থাকার জন্য হাঞ্চাপোলা নামক এক গ্রামের নির্জন বিহারে চলে যান। সেখান থেকে তিন মাইল দূরে সরস্বতী পরিবনে ৩ বৎসর ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

এরপর তিনি অরণ্য প্রধান ক্যান্ডির মহানগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তথাকার এক কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। শ্রীলংকায় অবস্থান কালে তিনি তথাকার বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাস্থবিরদের সাথে ধর্মালোচনা করার সুযোগ লাভ করেন। তন্মধ্যে ক্যান্ডি অরণ্যাশ্রমের বিশিষ্ট জার্মান পণ্ডিত ঞ্জনপোনিক

মহাস্থবির, বহুশ্রুত অগ্রমহাপণ্ডিত সংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমৈত্রেয় মহাস্থবির এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের নাম উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত বিদগ্ধ পণ্ডিত মন্ডলীর সাথে বৌদ্ধ দর্শন ও শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। ভদন্ত ঐগনপোনিক মহাথের ও ভদন্ত সংঘনায়ক আনন্দমৈত্রেয় মহাথের'র আগ্রহতিশার্যে ও আন্তরিক সাদর আহ্বানে ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের ঐগনপোনিকের সংগে ক্যান্ডির বনাশ্রমে এক বর্ষা এবং আনন্দমৈত্রেয় মহাথের'র সাথে বালাছোঁড়া পরিবেনে এক বর্ষা যাপন করেন। শ্রীলংকায় অবস্থানকালে তিনি সেখানকার ক্যান্ডি বনাশ্রমে ও নির্জন নদী তীরে ও শ্মশানে অনেক সময় ধ্যানে রত থাকতেন।

### বিনাজুরী শ্মশান বিহারে ১৯৬০-৬৩ সাল

শ্রীলংকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৬০ সালে তিনি বিনাজুরী শ্মশান বিহারে আগমন করেন। এই বিহারটিকে তিনি ভিক্ষুবাসের অত্যন্ত উপযোগী মনে করেই এখানে ৪ বর্ষা যাপন করেন। এ বিহারটি লোকালয় হতে অতি নিকটেও নয়, দূরেও নয়। এক নির্জন জায়গায় সোনার খালের তীরে অবস্থিত। এখানে অবস্থানকালে তিনি ৬/৭ জন ভিক্ষু-শ্রামণকে ধর্ম বিনয় শিক্ষা দিতেন। গ্রামবাসীকে ধর্মীয় জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা হতে ৪টা পর্যন্ত ভাবনা শিক্ষা দিতেন।

### শিলং বৌদ্ধ বিহারে ১৯৬৪ - ৬৭ সাল

১৯৬৩ সালের বর্ষাবাস শেষে তিনি তীর্থস্থান দর্শন মানসে ভারতে চলে আসেন। এ সময় শিলং এ চট্টগ্রামবাসী কয়েকজন বৌদ্ধ উপাসক ও ভক্তদের সাদর আহ্বানে তিনি শিলং বৌদ্ধ বিহারে চার বর্ষা যাপন করেন। এখানে ও তিনি বৌদ্ধদের সামাজিক উন্নয়ন ও ধর্মানুবোধ জাগ্রত করার জন্য প্রতিদিন বিকাল বেলা ধর্মদেশনা করতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক সুনীল বড়ুয়া ও অধ্যাপক ডঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার প্রচেষ্টায় ও অনুরোধে তিনি স্থায়ীভাবে ভারতে থেকে যেতে মন স্থির করেন।



### বোড়ালে ১৯৬৮ সালে

তঁার একান্ত ভক্ত কলিকাতায় বসবাসকারী অধ্যাপক সুনীল বড়ুয়া ও অধ্যাপক ডঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার সাদর আহ্বানে তিনি শিলং ছেড়ে কলিকাতায় আসেন এবং তাঁদেরই উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে বোড়াল নামক স্থানে ড. অরবিন্দ বড়ুয়ার বাগান বাড়ীতে এক বর্ষা যাপন করেন। এখানে অবস্থানকালে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান থেকে অনেক উপাসক-উপাসিকা ও ভক্তবৃন্দ তথায় ধর্ম শ্রবণের জন্য আগমন করতেন।

### শ্যামনগর জগদল বিহারে ১৯৬৯ সাল

শ্যামনগরের কতিপয় ভক্ত ও উপাসকের বিশেষ অনুরোধে তিনি ১৯৬৯ সালে শ্যাম নগর জগদল বিহারে বর্ষাবাস করেন। সেখানে বর্ষাবাসকালীন তিন মাস প্রতি রবিবার অপরাহ্নে তিনি ধর্মদেশনা করতেন। তঁার এই অমৃতময় ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য ইচ্ছাপুর ও অন্যান্য জায়গা থেকে বহু নর-নারী ধর্মসভায় যোগদান করতেন।

### লক্ষ্মৌ বোধিসত্ত্ব বিহারে - ১৯৭০ সাল

১৯৭০ সালে তিনি দিল্লী ও ভূটান ভ্রমণ করে লক্ষ্মৌ হয়ে নেপাল পরিদর্শনে যান। নেপাল থেকে পুনরায় লক্ষ্মৌ আসলে লক্ষ্মৌ বাসী কয়েকজন ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে তিনি সেখানকার বিহারে এক বর্ষাযাপন করেন। লক্ষ্মৌতে অবস্থানকালে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আগ্নেয় লাল ও অধ্যাপক সুনীল সরকার এবং আরো বেশ কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিতের সাথে আলাপ আলোচনায় তিনি বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ডঃ আগ্নেয় লালের অনুরোধে তিনি প্রতিদিন হিন্দিতে ধর্মদেশনা করতেন। ভক্তের অমৃতময় দেশনা শ্রবণ করে সেখানকার বেশ কিছু সংখ্যক লোক তঁার ভক্ত হয়ে উঠেন।

### বুদ্ধগয়া থাইমন্দিরে ১৯৭১-৭৩ সাল

১৯৭১ সালে তিনি বুদ্ধগয়াস্থ থাই মন্দিরের অধ্যক্ষ Lord Abbot এর বিশেষ

আমন্ত্রণে থাই মন্দিরে যান। সেখানে এক বর্ষা যাপনের পর, Lord Abbot এর বিশেষ অনুরোধে তিনি সেখানে আরও দুই বর্ষাযাপন করেন। বর্ষাবাসের পর সেখানে এক মাস যাবত শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মহাথেরর পরিচালনায় এই শিবিরে বহু নবীন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামণ ধর্ম বিনয় শিক্ষা লাভ করেছেন। থাই মন্দিরে এভাবে তিনটি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

### ইছাপুর আনন্দধামে ১৯৭৪-৭৬ সাল

১৯৭৪ সালে মহাথের মহোদয় ইছাপুর বসবাসকারী বাবু হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়ার বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁরই দ্বিতল ভবনে নির্মিত “আনন্দধামে” চলে আসেন। সেখানে তিনি তিন বর্ষা যাপন করেন। সেখান থেকে তিনি অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের সংঘনায়ক হিসাবে বিশেষ আমন্ত্রণে সেকেন্দ্রাবাদ, রামগড়, রাঁচি প্রভৃতি স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেছেন।

### কুশীনগরে ১৯৭৭ সাল

১৯৭৭ সালে ভদন্ত জ্ঞানেশ্বর মহাস্থবির মহোদয়ের অনুরোধে ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ স্থান কুশীনগরে এক বর্ষা যাপন করেন।

### পুনরায় বুদ্ধগয়াস্থ থাই মন্দিরে ৭৮ - ৮০ সাল

পুনরায় বুদ্ধগয়াস্থ থাই মন্দিরে ১৯৭৮ সালে Lord Abbot এর বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পুনরায় থাই মন্দিরে তিন বর্ষা যাপন করেন।

### দত্তপুকুর জেতবন বিহারে ১৯৮১-৮২ সাল

১৯৮১ সালে ভদন্ত জ্ঞানজগত মহাস্থবিরের বিশেষ আমন্ত্রণে তিনি দত্তপুকুর জেতবন বিহারে ২ বর্ষা যাপন করেন। এ সময় তাঁকে অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের সংঘনায়ক হিসাবে সংঘের কার্যোপলক্ষে আশ্রা, দিল্লী, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে যেতে হয়েছে। জেতবন বিহারে অবস্থানের সময় তিনি তিনটি বিদর্শন শিবির পরিচালনা করেন। তাঁর এ বিদর্শন পরিচালনায় ও ধর্মদেশনায় বহু নর-নারী বিপুলভাবে উপকৃত

হয়েছেন।

### বাংলাদেশে আগমন - ১৯৮৩ সাল

১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বাংলাদেশ অতীশ দীপংকর সহস্রতম জন্ম জয়ন্তী উৎসব কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে ঢাকায় আসেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং নিজ জন্ম-জনপদ পশ্চিম আধার মানিকে কয়েকদিন অবস্থান করে পুনরায় ভারতে ফিরে যান।

### পুনরায় ইছাপুর আনন্দধামে ১৯৮৩ সাল হতে কয়েক বৎসর

বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার পর তিনি ইছাপুর “আনন্দধামে” চলে যান। এখানে তিনি প্রতি রবিবার সায়াহ্নে ধর্মসভার আয়োজন করেন। এ ধর্মসভায় পার্শ্ববর্তী জায়গা থেকে ও অনেক ধর্মপ্রাণ নর-নারী ধর্ম শ্রবণার্থে যোগদান করতেন। ইছাপুর আনন্দধামে বসবাস করার সময় তিনি কয়েকটি বই ও রচনা করেন।

### নয়াদিল্লীস্থ চিত্তরঞ্জন পার্কে - জীবনের শেষ কটি বছর

ভক্তের বিশেষ ভক্ত নয়াদিল্লীস্থ চিত্তরঞ্জন পার্কে বসবাসকারী পুষ্প বড়ুয়ার বিশেষ আমন্ত্রণ ও অনুরোধে জীবনের শেষ কটি বছর উনার দ্বিতল ভবনে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তথাকার স্থানীয় বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনকে ধর্মসূধা বিতরণ করে অগণিত মানুষকে সদ্ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

### যুব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করণ ও সংগঠন

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, যে জাতির যুব শক্তি শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, ধর্মনীতিতে, চরিত্রে ও স্বাস্থ্যে উন্নত নয়, সে জাতি চিরদিন দুর্বল অসহায় শিশুর মত পিছিয়ে পড়ে থাকে। তাই ছাত্রবস্থা হতেই যুব শক্তিকে সংগঠন করার জন্য চেষ্টা করেছেন।

শুধু যুবকদের নয়, মহিলাদেরও সংগঠিত করার জন্য তিনি বিভিন্নভাবে উপদেশ

প্রদান করতেন। তিনি বলতেন মা যদি শিক্ষিতা ও ধর্মপরায়ন না হন - তাহলে শিশুর নৈতিক চরিত্রও ভাল হবে না। শিশুর নৈতিক চরিত্র ভাল না হলে ভবিষ্যতে সমাজ জীবনেও অন্ধকার নেমে আসবে।

সমাজে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন, নারীরা মাতৃজাতি বলে— আসলে সমাজে তাদের দান ও মেধা পুরুষ হতে বেশী। যে পুরুষ সমাজ, জাতি, এমনকি বিশ্ব পরিচালনা করেন “মা-ই” তো তাদের মানুষ করেছে। তিনি আরও লিখেছেন “যোগ্য নারী দ্বারা পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশ যেমন উন্নত হয়, ধর্মও তেমনি ধার্মিক নারীর দ্বারা উন্নত ও সুরক্ষিত হয়।

তাই তিনি যেখানে অবস্থান করেছেন, সেখানে যুবক ও মহিলাদের উন্নত জীবন যাপনের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেহেতু এই দুই শক্তির উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়, তাই তিনি তাঁর দেশনা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ প্রদান করেছেন।

### স্ব-গ্রামে

ছাত্রবস্থাতেই তিনি স্বগ্রাম পশ্চিম আধার মানিকে যুবকদের নিয়ে “তরুণ সংঘ” গঠন করেন। যুবকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তিনি স্থানীয় স্কুলের মাঠে শরীর চর্চা শিক্ষা দিতেন। সপ্তাহে একদিন বিতর্ক সভার আয়োজন করতেন। “নব জাগরণ” নামে মাসিক হস্তলিখিত পত্রিকা বের করতেন। তরুণ সংঘের সদস্যদের নিয়ে গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত ও সামাজিক কাজে সাহায্য করতেন। পাড়ার ছাত্রদের ডেকে এনে স্থানীয় নিগ্রোধারামে লেখাপড়া শিখাতেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নিগ্রোধারামে সমবেত উপাসনার প্রচলনও তিনি করেছিলেন সেই ছাত্র জীবনেই।

### রাউজানে

ম্যাট্রিক পাশের পর রাউজানে শিক্ষকতা করার সময়ে তিনি সেখানকার ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে ক্লাব গঠন করেন। ক্লাবের সদস্যদের তিনি শরীর চর্চা শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে নিয়ে সামাজিক কাজে সাহায্য করতেন। ।

## কর্তালায়

কর্তালায় অবস্থানকালে তিনি সেখানকার ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে “তরুণ সংঘ” গঠন করেন। প্রতি রবিবারে সংঘের সদস্যদের সভা আহ্বান করে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র এবং ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করতেন। এখানেও তিনি “তরুণ জাগরণ” নামে হস্ত লিখিত মাসিক পত্রিকা বের করেন।

## বেতাগী

বেতাগীতে দীর্ঘ চার বৎসর অবস্থানকালে তিনি বৃদ্ধদের জন্য “বিহার সমিতি”, যুবকদের জন্য “পল্লী মঙ্গল সমিতি” এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য “নবীন সংঘ” গঠন করে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করেন। এভাবে তিনি সংগঠনের মাধ্যমে বেতাগীবাসীর সার্বিক উন্নয়ন সাধন করেছিলেন।

## সাহিত্যানুরাগ

জীবনের প্রতিটি সময়কে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। বৃথা সময় তিনি কখনও ব্যয় করেন নাই। তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধ্যান সাধনা। কিন্তু তিনি শুধু ধ্যান নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। সময়ের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছিলেন। তিনি একাধারে ধ্যানী, গবেষক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক ছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অধিকাংশ বইয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও ভারতীয় অনেক মনীষীদের জীবন দর্শন সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবগত ছিলেন। ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত বিভিন্ন বইয়ে ইংরেজ মনীষীদের উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন।

তিনি যে একজন সুলেখক, পণ্ডিত ও লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর লিখিত বইগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর লিখিত বইগুলি হচ্ছে—

- ১। আমার সমাজ, ২। আনন্দলোকে, ৩। আদর্শ বৌদ্ধ জীবন, ৪। সত্য-সংগ্রহ, ৫। ধর্ম সুধা

৬। বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম, ৭। অমৃতের সন্ধানে, ৮। মহামঙ্গল, ৯। প্রজ্ঞা-সাধনা, ১০।  
সত্য সাধনা

১১। Buddhism A human Religion ১২। Pre-Eminence of the Buddha

এছাড়া অপ্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে :

১। বিদর্শন ভাবনার ফল ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, ২। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন, ৩। ভারতের দার্শনিক বিকাশ, ৪। জ্ঞানালোকে ইত্যাদি।

### ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা

ছাত্রাবস্থা হতেই তিনি একটু সময় পেলে ধর্মীয় বই নিয়ে নির্জন জায়গায় অথবা বিহারে গিয়ে পড়তেন। তাঁর বাল্য শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া ও চির কুমার ডাক্তার প্যারী মোহন বড়ুয়ার সংস্পর্শে এসে তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। যখন ধর্মের কোন একটা জটিল বিষয় তাঁর মনে জাগ্রত হত, তখন তিনি পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া, অথবা ডাঃ প্যারীমোহন বড়ুয়ার সাথে আলাপ করে তিনি ঐসব প্রশ্নের সমাধান পেতেন। ডাঃ প্যারীমোহন বড়ুয়া তাঁর এসব জানার আগ্রহ দেখে তাঁকে আরও অধিক ধর্মীয় বই পড়ার ও ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।

প্রব্রজ্যা জীবনের প্রথমেই তিনি লাভ করেছিলেন উপযুক্ত গুরু অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের সান্নিধ্য। তাঁর স্নেহ সান্নিধ্যে তিনি এক বৎসর ধর্ম বিনয় শিক্ষা করে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

অতঃপর ১৯৩১ সালে তিনি বিনয়াচার্য বংশদীপ মহাস্থবিরের নিকট গমন করেন। সেখানে গুরুদেবের সান্নিধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৫৪ সালে মায়ানমারে ৬ষ্ঠ সংগায়ন শেষে তিনি কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি সেখানকার কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত মহাস্থবিরের সাথে ধর্মালোচনা ও ধ্যান সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে খুব প্রীতি উপভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে মায়ানমার সরকারের সৌজন্যে পাঁচ বছরের বৃত্তি নিয়ে শ্রীলংকায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন। শ্রীলংকায় তিনি বিভিন্ন কলেজে ধর্মশাস্ত্র

অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি তথাকার বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাস্থবিরদের সাথে ধর্মালোচনার সুযোগ লাভ করেন। তন্মধ্যে ক্যাভি অরগ্যাশ্রমের বিশিষ্ট জার্মান পণ্ডিত এগনপোনিক মহাস্থবির, বহুশ্রুত অগ্রমহাপণ্ডিত সংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দ মৈত্রেয় মহাস্থবির এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত পণ্ডিত মন্ডলীদের সাথে ধর্মালোচনা করে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

এছাড়া ও তিনি থাইল্যান্ড ও ভারতের বহু জ্ঞানী-গুণী বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাস্থবিরের সাথে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

### সাধনা

গৃহীতজীবন থেকেই তাঁর ধ্যান সাধনার সূত্রপাত হয়। গ্রামের মগদাই নদীর পাশের শ্মশানে তিনি একাকী বসে ধ্যান অভ্যাস করতেন। গৃহীতজীবন থেকে দূরে থাকার প্রয়াস ও নিরাসক্ত জীবন যাপনের উদ্যম ছাত্রাবস্থা হতেই পরিলক্ষিত হয়।

ভিক্ষু হওয়ার পর তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন মানসে আকিয়াবে চলে যান। সেখানে পোতুলি মহাশ্মশান ও চারিপোক্ত মহাশ্মশানে হিংস্র স্বাপদ সংকুল বন্য পশুর ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে শ্মশানিক, ত্রিচীবর পিণ্ডপাতিক ও একাসনিক বিভিন্ন প্রকার ধূতাজ ব্রতাদি পালন করেন। এরপর তিনি পাথরকিল্লা অরগ্যাশ্রমে ও অনুরূপভাবে ঐ সব ধূতাজ ব্রতাদি পালন করেন।

শ্রীলংকায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় তিনি সেখানকার বিশিষ্ট ধ্যান গুরুদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তথাকার ক্যাভি অরগ্যাশ্রমে অবস্থান করার সময় তিনি নির্জন নদীতীরে, শ্মশান ও গভীর অরণ্যে ধ্যান সাধনা করেছেন। ছতরপিটুয়া অরগ্যাশ্রমে ও বেতাগী বনাশ্রমে বর্ষাবাস যাপন করার সময়ে হিংস্র স্বাপদ বন্য প্রাণীদের ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে ধ্যান সাধনার যোগ্য স্থান হিসাবে নির্বাচন করে কয়েক বৎসর ধ্যান সাধনা করেন।

এ ধ্যানের অনুপ্রেরণা তিনি পরপারগত আর্যপুরুষ ভদন্ত জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির হতেই লাভ করেছিলেন। শ্রীলংকায় ও বার্মায় অবস্থানকালীন সময়ে সেখানকার প্রখ্যাত ধ্যানগুরুদের সাথে ধ্যানের বিধি বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করে তা তিনি সম্যকভাবে

অবগত হন; যা পরবর্তী জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন শমথ ভাবনাকারী। যেই ভাবনা ক্ষুরধার সম সুস্ব এবং দশ প্রকার কর্মস্থান নিয়ে এ ভাবনা। এই সাধনার ফলে সাধক লাভ করেন চিত্তশুদ্ধি, ঋদ্ধি, একাগ্রতা, দিব্যদৃষ্টি, পরচিহ্ন বিজ্ঞান জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান ও সমাধি আদি। এ ভাবনা কঠোর হতে কঠোরতম। যা তিনি বেচে নিয়েছিলেন জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাবনা। এ ভাবনার কঠোর নিয়ম পালনে অনেকসময় তিনি আহার পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি পাহাড়ে, শাশানে ও বনাশ্রমে স্থাপদ সংকুল অরণ্যে কাটিয়েছেন ধ্যানের উপযুক্ত স্থানরূপে। তাঁর শান্ত সৌম্যভাব, তেজোময় প্রভা, আচার-আচরণে ও কথায় প্রকাশ হত তিনি একজন সার্থক ধ্যানী। তিনি তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দকে ধ্যানের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের বিভিন্নস্থানে ধ্যান শিবির পরিচালনা করে বহু লোককে আত্মোন্নতির সাধন মার্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন তিনি কত মহান সাধক ছিলেন।

### অভিধা প্রাপ্তি

১৯৫২ সালে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার নেতৃস্থানীয় অনেক ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে বেতাগীর বনাশ্রমে মহাসমারোহে তাঁকে মহাশ্রবির অভিধায় ভূষিত করা হয়। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রাম থেকে এবং তিনি যে সমস্ত জায়গায় বর্ষাবাস যাপন করেছেন, সে সব গ্রাম থেকে অগণিত ভক্তবৃন্দ ও উপাসক-উপাসিকাদের উপস্থিতি সেদিন বেতাগীর বনাশ্রমকে জনসমুদ্রে পরিণত করেছিল। মহাথের বরণ উপলক্ষে সেদিন বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানপত্রের মাধ্যমে তাঁর ভক্তরা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ধ্যান সাধনা ও প্রজ্ঞার সুফল স্বরূপ তিনি বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজকে গৌরবের উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মায়ানমার সরকার প্রদত্ত পাঁচ বছরের বৃত্তি নিয়ে তিনি শ্রীলংকায় ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই পাঁচ বছর তিনি সেখানকার বিভিন্ন কলেজে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও ত্রিপিটকের গভীর তত্ত্বাদি ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা সাধনা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতদের সাথে গভীরভাবে আলোচনা করতেন। তাঁর এই কৃতবিদ্যা শাস্ত্র লব্ধ জ্ঞানের স্বীকৃতি



স্বরূপ সেখানকার পণ্ডিতমন্ডলী শ্রীলংকার “সরস্বতী পরিবেন” থেকে তাঁকে “ত্রিপিটক বাগীশ্বর” উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭০ সালে বহু গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত, দার্শনিক পূজ্য ধর্মধার মহাস্থবির মহোদয়ের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় ভিক্ষুসংঘ গঠিত হয়।

ঐ সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ড. ভদন্ত জগদীশ কাশ্যপ মহাস্থবির মহোদয়কে অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের সংঘনায়ক এবং ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়কে অনুনায়ক পদে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংঘনায়ক ভদন্ত জগদীশ কাশ্যপের আকস্মিক মহাপ্রয়াণ হলে ১৯৭৬ সালের ৬ই মার্চ অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের সর্বসম্মতিক্রমে ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়কে সংঘনায়ক পদে ভূষিত করা হয়। মহাপ্রয়াণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থেকে সুচারুরূপে সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম ও দায়-দায়িত্ব পরিচালনা করেছেন।

### চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরের কথা স্মরণ করলে সর্বাত্মে মনে পড়ে তাঁর নির্মল চরিত্রের কথা। তাঁর মত নির্মল চরিত্রের অধিকারী, আত্মজয়ী সিংহপুরুষ বৌদ্ধ সমাজে বিরল। তিনি বহুগুণে গুণান্বিত। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল - তিনি একজন তেজস্বী আদর্শ ভিক্ষু, সত্যসন্ধানী, একক বিহারী, ব্রহ্মচারী, অরণ্য বিহারী, ধূতান্ন সাধক। তিনি যা সত্য বলে চিন্তা করেছেন, এবং জেনেছেন, শেষ পর্যন্ত সেই সত্যকে উদ্ঘাটন করেছেন।

### সম্বর্ধনা

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্টীমার যোগে তিনি শ্রীলংকা থেকে মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। ভদন্ত শ্রীলংকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন একথা শুনে চট্টগ্রামের স্টীমার ঘাটে বিভিন্ন গ্রামের বহু গণ্যমান্য ভিক্ষু ও গৃহী তাঁকে সংবর্ধিত করার জন্য সমবেত হয়েছিল। ভন্তে যে সমস্ত জায়গায় বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন, সে সব বিহারে নিয়ে যাবার জন্য সবাই ভন্তেকে অনুরোধ জানান। ভন্তে সবাইকে সান্ত্বনা

বাক্যে সন্তুষ্ট করে, স্বগ্রাম নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সাথে নিজ জন্ম-জনপদ, পশ্চিম আধার মানিকে চলে আসেন।

শ্রীলংকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর, চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা থেকে, তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার যে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, তা এক অভাবনীয় বিষয়। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জনসাধারণের নিকট তিনি ছিলেন এক ধ্যানকল্প আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর চলনে, দেশনে ও শান্ত সৌম্যভাব, সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট তাঁকে শ্রদ্ধার ও সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তাই তাঁকে সম্মান জানানো তাঁর অগণিত ভক্ত ও বৌদ্ধ জনসাধারণ নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করে, তাঁকে সম্মানের উচ্চ আসনে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রথমে তাঁকে নিজ জন্ম-জনপদ পশ্চিম আধার মানিকে, দল মত নির্বিশেষে উভয় নিকায়ের অনেক ভিক্ষুসংঘের সমন্বয়ে এবং বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে সম্বর্ধিত করা হয়। দেশে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্য ও শীলাচার গুণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামে তাঁকে মানপত্রের মাধ্যমে অভিনন্দিত করা হয়।

### নিগ্রোধারাম নির্মাণে ভক্তের উপদেশ

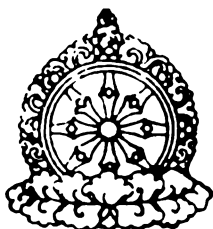
১৯৮৩ সালে মহাথের মহোদয় অতীশ দীপংকর সহস্রতম জন্ম-জয়ন্তী কমিটির আমন্ত্রণে ঢাকায় আগমন করেন। এরপর তিনি নিজ জন্ম-জনপদ পশ্চিম আধার মানিকে চলে আসেন, এবং নিগ্রোধারামে অবস্থান করেন। একদিন সন্ধ্যার সময় ধর্মদেশনার পর নিগ্রোধারামের দায়কদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, “তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পাকা দালান অথবা উন্নত গৃহে বাস কর। আর ভিক্ষুসংঘদের জন্য এরকম একটি জীর্ণ শীর্ণ বিহার নির্মাণ করেছ; যেখানে ভিক্ষু বসবাস করার কোন পরিবেশ নাই। এ রকম বিহারে কোন ভাল ভিক্ষু থাকবে কিনা বল”। ভক্তে উপস্থিত সবাইকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে বিহার নির্মাণের জন্য সম্মত করান। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিগ্রোধারামের দায়কবৃন্দ পরবর্তীতে রাউজান আনন্দ বিহারের অধ্যক্ষ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামন্ডলের ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ভদন্ত শীলানন্দ মহাস্থবিরের পবিত্রকর স্পর্শে বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই

দুই মহাপুরুষের আশীর্বাদে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিখোঁধারাম পূর্ণাঙ্গ বিহাররূপে নির্মিত হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, তাঁর আদর্শে বিহারখানি নির্মাণ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু বিহারখানি স্বচক্ষে তিনি দেখে যেতে পারেননি। যেহেতু তিনি আর মাতৃভূমিতে আসেন নাই।

### জন্ম-জয়ন্তী উৎসব

চরকানাই রত্নাংকুর বিহারে তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। তাঁর চরিত্র মাধুর্যে ও ধর্মদেশনায় মুগ্ধ হয়ে সেখানকার জনসাধারণ ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রথম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। এরপর অনেক ভিক্ষুসংঘ ও বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের সমাগমে বাগোয়ানে জন্ম-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ১৯৭৮ সালে সেকেন্দ্রাবাদে তাঁর ৭১তম জন্ম-জয়ন্তী পালনের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। ১৯৮২ সালে যথোচিত মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁর “হীরক জয়ন্তী” উৎসব পালিত হয়, ইছাপুরে। এছাড়া ও প্রতিবৎসর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মহাথের মহোদয়ের ভক্তরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, গুরুপূজা ও জন্মোৎসবের আয়োজন করত।

একবার আমি তাঁর জন্মোৎসবে একটি কবিতা রচনা করে পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে একটি পোষ্ট কার্ডের মাধ্যমে লিখেছিলেন। এখানে সেই পোষ্ট কার্ডটির লিখা ছবছ লিপিবদ্ধ করলাম।



From :

**Ananda Mitra Mahathero**

Anandadham, Baudha Palli

P.o. Ichapur, 24 Pargans

Pin : 743144, W. Bengal

India. Dt. 10.02.91

স্নেহের অনিল,

আশীর্বাদ করছি তোমরা সবাই উন্নত ও সুখী হও । গতকল্য সম্পাদক এসে তোমার পত্র দিল এবং তোমার কবিতা দেখাল ।

এখানে প্রতি বছর আমার জন্মোৎসব এরা করে । প্রতি বছর স্মরণিকা বাহির করে না । বিশেষ উৎসবে করে । কবিতা পরে পেয়েছি বলে তা রেখে দিতে বলেছি । ভবিষ্যতে কোন সভায় তা পাঠ করে শুনানো হবে । আমার জন্মদিন ১লা ফেব্রুয়ারী আনন্দধামে ভোর ছয়টায় এবং বিহারে ৮টায় আমার পূজার ব্যবস্থা করে । আর পরের রবিবার সংঘদান, অভ্যাগত ভোজন ও ধর্মসভা করা হয় ।

এ বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারীতে আনন্দধামে ৬৩ জন ভক্তের সমাগম হয় । আমার পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করলে, প্রত্যেককে আশীর্বাদ স্বরূপ ১টি চকলেট ও ১টি টাকা দেওয়া হয় । গত বৎসর ১টি চকলেট ও একটি আধুলি এবং আগের বছর ১টি চকলেট ও ১টি দশ পয়সার মুদ্রা দেওয়া হয় । হেমেন বাবু প্রতি বৎসর সমবেত সবাইকে পায়স, বিস্কুট ও চা দান করেন । এ বৎসরও গত বৎসর এদিন ৭০/৮০ জন ভক্তদের আহার দেওয়া হয় ।

৮টার সময় বিহারে বুদ্ধ পূজার পর, ধর্মদেশনার পরে, আমার পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করা হয় । আমার হাতে প্রসাদ স্বরূপ ১টি কোক ও একটি কলা দেওয়া হয় । তার সাথে টাকা আধুলি এবং দশ পয়সার মুদ্রা ও চকলেট দেওয়া হয়েছে ও

বৎসর। বিহারে জন সমাগম শতাধিক হয়।

এ দিনের আহার, মুদ্রা ও চকলেট দাতা দিল্লীর পুষ্প বড়ুয়া। গত ৩ বৎসর সে এসে প্রতি বৎসর হাজার টাকা হতে বেশী ব্যয় করে দান দিয়ে যায়। এ বৎসর লক্ষ্যে হতে হরিহর বাবা (সন্তোষ) দান করার জন্য ১০০০ টাকা এনে আমার উৎসবের জন্য প্রায় হাজার টাকা দিয়েছে। বোম্বে হতে এক নব বৌদ্ধ ৫০০ টাকা পাঠিয়েছে।

এ বৎসর দিল্লীতে শান্তি (পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রয়াত বাবু বরদা মহাজনের মেয়ে) প্রমুখ ভক্তগণ ১লা ফেব্রুয়ারী আমার জন্ম জয়ন্তী করেছে বলে জানিয়েছে। তারা এখানের উৎসবের জন্য ৩৫০ টাকা পাঠিয়েছে। সংক্ষেপে জন্মোৎসবের বিষয় জানালাম।

বিহারের কক্ষটি পরিপূর্ণ করে ফেল। ২/১ জনকেই এর জন্য প্রাণপন করে পরিশ্রম করতে হবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত মূর্খরা, মূর্খের কাজ করবেই। সব বাঁধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই, সিংহবিক্রমে জনহিতকর কাজের জন্য, আজীবন দিবারাত্র পুণ্য বর্ধক সর্বশ্রেষ্ঠ দান কর্ম, যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়েই এ সুখময় কাজ করে নাও।

ইতি  
তোমাদের মঙ্গলকামী  
ভন্তে

ভন্তের দ্বিতীয় পোষ্ট কার্ডখানাও অনুরূপ লিপিবদ্ধ করলাম।

From :  
**Ananda Mitra Mahathero**  
Ananda Bhaban, E-803,  
C.R. Park  
New Delhi-11009  
21/10/97

স্নেহের অনিল,

আশীর্বাদ করছি তোমরা দেশবাসী সবাই উন্নত ও সুখী হও। তোমার ৮/১০/৯৭ পত্র কাল পেয়েছি। পরিমলের পত্রটি খগেন্দ্রকে দিতে বলেছি।

শান্তরক্ষিত ও জ্ঞানালোকের মৃত্যু সংবাদে দুঃখিত হলেও তা তো প্রাকৃতিক বিধি। আশা করি তোমরা গ্রামবাসী ও দেশবাসী মিলে মহাসমারোহে তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করবে এবং তাঁদের স্মৃতি পূজার ব্যবস্থা করবে।

প্রাকৃতিক নিয়মে আমিও তো এখন অন্তিম ক্ষণের অপেক্ষায় আছি মাত্র। ১৯০৮ এর ১লা ফেব্রুয়ারী আমার জন্ম। আমার ৯০তম জন্মোৎসব দিল্লীর ৩ স্থানে ৩ দিন এবং ইছাপুরে (কলিকাতায়) সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়েছে।

আমার এ অবস্থায় তোমাদের নিকট যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে আমি অন্যস্থানের তুলনায় নিরুপদ্রবে আছি। শিক্ষিত হিন্দু প্রধান স্থান। ৩ তলার উপর আমার জন্য নির্মিত “আনন্দ ভবন”-এ আছি। বড়ুয়ারা অনেক দূরে। কিছু দূরে অল্প কয়েক ঘর থাকলেও বৃদ্ধরা উপরে উঠতে পারে না। প্রধানতঃ এক পরিবারই আমার দায়ক। তাই শেষকালে শান্তিতে আছি। প্রাকৃতিক নিয়মে বার্ষিক্যের উপদ্রব তো থাকবেই।

ইতি-

তোমাদের মঙ্গলকামী

ভগ্নে

এভাবে ভক্তরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরব প্রদর্শন করে, প্রতি বছর বিভিন্ন জায়গায় জন্মোৎসব ও গুরুপূজার আয়োজন করতেন। এতেই বুঝা যায় যে মহাথের মহোদয় কতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

## মহাপ্রয়াণ

জীবনের শেষ মুহূর্তে ইহলীলা সংবরণের আগে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আর বেশীদিন তিনি ইহজগতে থাকবেন না। মৃত্যু যে আসন্ন তা তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি নূতন দিল্লীতে বসবাসকারী তাঁরই জন্ম-জনপদের, পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রয়াত বাবু বরদা মহাজনের ১ম পুত্র বাবু খগেন্দ্র লাল বড়ুয়াকে সাক্ষাৎ করার জন্য খবর দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য, খগেন্দ্র বাবু যথাসময়ে খবর না পাওয়ায় ভক্তের সাথে শেষ দর্শন করতে পারেন নাই।

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। সত্যের চেয়ে মহাউপকারী এ জগতে আর কিছুই নেই। এ সত্য জেনে তিনি ১৯৯৯ সনের ৪ঠা মার্চ সকাল ৭ ঘটিকায় তাঁর অগনিত ভক্ত, উপাসক উপাসিকা, দায়ক-দায়িকা ও সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে, শোক সাগরে নিমজ্জিত করে, তাঁর অভিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছেন।

“অনিচ্ছা বত সংখারা”

১০ই মার্চ ৯৯ ইংরেজী বিপুল সংখ্যক ভিক্ষুসংঘ, ভক্ত দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকার সমাগমে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সু-সম্পন্ন করা হয়।

প্রয়াত ভক্তের একনিষ্ঠ ভক্ত, স্ব-গ্রামের ভিক্ষু সন্তান ধর্মদূত প্রয়াত বিবেকানন্দ থের এমএ (ডবল) মহোদয় তখন বুদ্ধগয়াস্থ বাংলাদেশ বিহারে অধ্যক্ষ হিসাবে, বুদ্ধগয়াতেই অবস্থান করতেন। তিনি কলিকাতা আসলে ভক্তের মহাপ্রয়াণের কথা শুনে, নূতন দিল্লীতে এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। জ্ঞাতি কর্তব্য যিনি এভাবে পালন করলেন, তিনিও জীবনের অনিত্যতার বিধান হঠাৎ আমাদের ছেড়ে অকালে চলে যাবেন একথা সেদিন কে জানতো?

## উপসংহার

পরপারগত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি একাধারে ধুতান্গসাধক, বাগ্মী, সুলেখক, সুদেশক, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, একক বিহারী, দৃঢ়বীর্য পরাক্রম, সত্যসন্ধানী, গবেষক ও ধর্ম প্রচারক, একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষুর যতগুলি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, তাঁর মধ্যে সব গুণগুলি বিদ্যমান ছিল।

ভিক্ষু উপসম্পদা লাভের কয়েক বৎসর পর তিনি আকিয়াবে চারিপোক্ত ও পোত্তলি মহাশ্মশানে এবং গভীর অরণ্যে ধুতান্গ ব্রত পালনের মাধ্যমে কঠোর তপঃচরণে রত ছিলেন। তারপর তিনি জ্ঞানান্বষনের জন্য পাঁচ বৎসর শ্রীলংকায় অতিবাহিত করেন।

তারপর তিনি তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান নিয়ে ফিরে এলেন লোকালয়ে। লোকালয়ে ফিরে এসে তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামের বিহারে বর্ষাবাস যাপন করেন। এক নাগাড়ে দীর্ঘ কয়েক বৎসর কোন বিহারে তিনি বর্ষাবাস যাপন করেন নি। যেহেতু তিনি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন যে, বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের কারণগুলির মূল উৎস কোথায়। তাই তিনি বিভিন্ন গ্রামের বিহারে বর্ষাবাস করেও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিশে সমাজের অবক্ষয়ের কারণগুলি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্প হলেন এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে রচনা করলেন “আমার সমাজ”।

এ গ্রন্থে তিনি সমাজের অবক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ ও দোষত্রুটি উদ্ঘাটন করেছেন। দায়ক ও ভিক্ষুর কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে ও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। “আদর্শ বৌদ্ধ জীবন” গ্রন্থে তিনি মানুষকে পরমার্থ মানবে উন্নীত করতে - জাতিগত বৌদ্ধদের আদর্শ জীবন গঠনে ও যাপনে উৎসাহিত করেছেন। “সত্য সংগ্রহ” গ্রন্থে তিনি চতুরার্য সত্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সত্য উপলব্ধির দ্বারা দুঃখ মুক্তির জন্য চেষ্টিত হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। “অমৃত্যের সন্ধান” বৌদ্ধদের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য ভাবনা কর্মাদির মাধ্যমে পথনির্দেশের চেষ্টা করেছেন। “আনন্দলোকে” এর বিষয়বস্তু হল বুদ্ধগুণ। সাধারণ লোকের ধারণা-বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সংঘের নয় গুণ। ত্রিরত্নের এই গুণগুলি



তাঁর সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধগুণ যে, কত অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অনন্ত  
 তার সীমা-পরিসীমা নাই। বুদ্ধগুণ যে, কত অপ্রমেয় তা স্বয়ং তথাগত সম্যক  
 সমুদ্রের গুণাবলী বর্ণনা করেন তাহলে সুদীর্ঘ কাল পরে কল্প শেষ হবে - তথাপি  
 বুদ্ধগুণ বর্ণনা শেষ হবে না। এখানে তিনি বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার সম্যক পরিচয়  
 দাটিয়েছেন। “মহামঙ্গল” গ্রন্থে তিনি বুদ্ধদেশিত আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের ব্যাখ্যা  
 দাওয়া ওৎসঙ্গে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মঙ্গলের ফলের বিশদ  
 ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি যে কত মহান সাধক ও সত্যান্বেষী ছিলেন তা তাঁর রচিত প্রত্যেকটি  
 গ্রন্থে স্বীয় লব্ধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের হিত সাধনে তিনি বিভিন্ন  
 পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম দেশনার মাধ্যমে  
 সামাজিক ও ধর্মীয় দোষত্রুটিগুলি তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য তাঁর  
 লেখনী ও দেশনার মাধ্যমে যদি সমাজের কিছু লোক ও সম্যক জ্ঞানী হতে পারে  
 তবেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে।

বৌদ্ধ সমাজে যে কয়জন জ্ঞানী-গুণী ক্ষনজন্মা বৌদ্ধ ভিক্ষু জনগ্রহণ করেছেন  
 এবং বৌদ্ধ সমাজকে বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন তন্মধ্যে প্রয়াত  
 আনন্দমিত্র মহাথের একজন। তিনি একজন বাস্তববাদী আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন।

“জয়তু আনন্দমিত্র মহাথের”

সমাপ্ত

# ଏକବୀଂଶ ପରିଚିତି



অন্তিম শয্যায় শায়িত মহামান্য সংঘনায়ক ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের

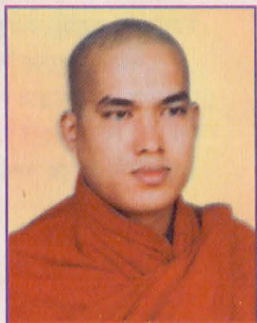


স্ব-গ্রামের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতি শান্তি বালা বড়ুয়ার (প্রয়াতঃ বরদা মহাজনের  
মেয়ে) সাথে মহামান্য সংঘনায়ক **ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের** ।





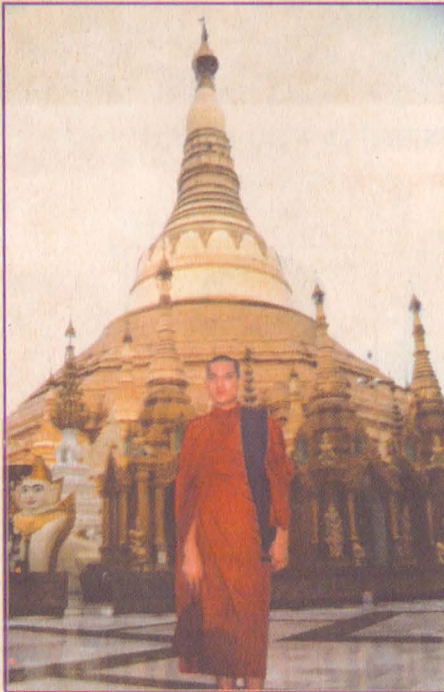
মহামান্য সংঘনায়ক **ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের**’র সাথে  
ধর্মদূত **ভদন্ত বিবেকানন্দ থের** এম,এ (ডবল)



আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা  
**ভদন্ত বিপুলবংশ ভিক্ষু ও ভদন্ত শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষু** ।



ধর্মদূত **ভদন্ত বিবেকানন্দ থেরকে** (এম,এ ডবল) আশীর্বাদ প্রদান করছেন,  
মহামান্য সংঘনায়ক **ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের**।



মায়ানমার (বার্মা) অবস্থানের  
সময় রেঙ্গুনের বিখ্যাত  
সোয়েডাগন প্যাগোডার সামনে  
**ভদন্ত বিপুলবংশ ভিক্সু**  
(জীবনী গ্রন্থের সম্পাদক)





## লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



নির্বাণকামী, সত্যসন্ধানী, অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘের মহামান্য সংখনায়ক, প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের মহোদয়ের পুত্র পবিত্র জীবন চরিত রচয়িতা **বাবু অনিল কান্তি বড়ুয়া** মহোদয় ১৯৩৭ ইংরেজী সনের ২৩শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাউজান থানার অন্তর্গত পশ্চিম আধারমানিক গ্রামের এক ধার্মিক ও আদর্শ বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম প্রয়াত সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া (সওদাগর) ও মাতা প্রয়াত নিরবালা বড়ুয়া। তিনি ১৯৫৯ ইংরেজীতে ম্যাট্রিক ও পরবর্তীতে আই, এ পাশ করেন। এরপর ১৯৬৫ ইংরেজীতে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। শিক্ষকতা জীবনের মাঝখানে তিনি সি.ইন.এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি একজন নীতিবান ও আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ও সংস্কৃতিমনা উদার ব্যক্তি। অনেক কবিতা ও অনিত্যমূলক কীর্তন তিনি রচনা করেছেন। তার রচিত কবিতাগুলি ও কীর্তনাবলী দুটি বই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে। তার রচিত অনেক কবিতা ধর্মীয় ম্যাগাজিন ও স্মরণিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৩ ইংরেজীতে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান সমূহ দর্শন করেন। ১৯৯৮ ইংরেজীতে তিনি শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ২০০০ ইংরেজীতে বৌদ্ধ প্রতিরূপ দেশ মায়ানমারের রেঙ্গুন, মেন্ডেলে, মেমিও, অংবা, কুলং, পিডিয়া, চেগাই, কালাও, চৌমে এর দর্শনীয় স্থান সমূহ দর্শন করেন। তার মাতার মৃত্যুর পর ২য় বার ২০০৩ সালে মায়ানমার (বার্মা) গমন করেন এবং সেখানে জীবন্ত অরহত কুলং ছোয়াদকে দুইবার দর্শন করেন এবং তথায় দুইবার অষ্টপরিষ্কার দান করেন। মেমিওতে ও তিনি একজন অরহত ভগ্নে দর্শন করে (বর্তমানে পরিনির্বাণিত) জীবনে অশেষ পুণ্য সম্পদ অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। জীবন্ত অরহতের দর্শন লাভ করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সৌভাগ্যবান ও পুণ্যবান। এছাড়াও তিনি অনেক পুণ্য কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সরল, অমায়িক এবং শীলবান। গ্রামের প্রত্যেক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। বর্তমানে তিনি ৬৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। তাঁর নিরাময় ও সুদীর্ঘ জ্ঞানময় জীবন কামনা করছি।

হিত-

**ডাঃ দুলাল চন্দ্র বড়ুয়া**

পশ্চিম আধার মানিক

রাউজান, চট্টগ্রাম।